স্কুল-কলেজের মেয়েদের ডিটেকটিভ উপন্যাস

'কৃষ্ণা-সিরিজের' প্রথম গ্রন্থ

কারাগারে কৃষ্ণা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দেব সাহিত্য কুটীর

কলিকাতা

উপহার

কারাগারে কৃষ্ণা

তাড়াতাড়ি কলেজে বেরোবার মুখে যে পত্রখানা কৃষ্ণার হাতে এসে পড়লো, সেখানা তখন পড়বার সময় না পেয়ে সে তার ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলে।

ক্লাস আরম্ভ হবার দু'মিনিট আগে সে কলেজে পৌঁছোলো এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বসলো। তারপর পত্রের কথা তার আর মনেই রইলো না সারাদিন।

বৈকালে বাড়ী ফিরেও সে ভুলেছিল...মনে পড়লো রাত্রে খাবার সময়।..."তাই তো, কি যে ভুল আমার, সারা দিনটা গেল—পত্রখানার কথা মনেও পড়লো না একবার!"

খাবার টেবিলে ব'সে মামা প্রণবেশ গম্ভীরমুখে বললেন, "কার পত্র? কে লিখেছে, কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা হাসিমুখে বললে, "সেই কথাই তো বলছি, মামা। চিঠিখানা না খুললে কেমন ক'রে বুঝবো যে, পাঠিয়েছে কে আর কোথা থেকে আসছে! মোট কথা, মোটেই সময় পাইনি পড়বার। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া যাক্, কি বলো?"

প্রণবেরও ইচ্ছা তাই। তাঁকেও আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে হবে; কারণ, আজই লাইব্রেরী থেকে তিনি একখানা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস এনে এক-নিশ্বাসে দু'ঘণ্টায় খান-তিরিশ পাতা প'ড়ে ফেলেছেন এবং বাকিটুকু যে আজ রাত্রেই শেষ ক'রে ফেলবেন সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

পড়াটা তাঁর বরাবরই ধীর, এজন্য কৃষ্ণার অনুযোগের অন্ত নাই, কিন্তু মামা এক-কথায় সেরে দেন। তিনি নিজের সঙ্গে কচ্ছপের ও কৃষ্ণার সঙ্গে খরগোসের তুলনা দিয়ে গম্ভীরভাবেই বলেন, "হলুমই-বা আমি কচ্ছপ, তবু যে-কোনো কাজে আমার নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আছে এ-কথা তো মান্‌বি, কৃষ্ণা! তোর সব কাজ তাড়াতাড়ি—পড়াও তাড়াতাড়ি—একবার চোখ বুলিয়ে যাস্ বইতো নয়। কিন্তু, আমি? আমি যতটুকু পড়ি, চিবিয়ে-চিবিয়ে পড়ি, কুড়ি বছর পরেও সে-পড়ার কথা আমার মনে থাকে—জানিস্?"

তারপর আরম্ভ ক'রে দেন ছোটবেলায়-শেখা একটি কবিতা —"ও কল মাই ব্রাদার ব্যাক টু মি।"…আর কবিতার এই লাইনটি আবৃত্তি ক'রেই সগর্ব্বে বলেন, "দেখলি তো, সেই কোন্ ছোটবেলাকার কবিতা, আজও কেমন জলের মত মুখস্থ বলতে পারি,—কোথায় কমা, কোথায় ফুলষ্টপ, কোথায় সেমিকোলন—কোনো জায়গা আমার ভুল হয়না—তবুও তুই বলতে চাস্…"

কৃষ্ণা হাসে। মামার বুদ্ধির প্রশংসা করে…স্মরণ-শক্তির প্রশংসা করে।

খাওয়া শেষ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে প্রণবেশ নিজের ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর আরাম ক'রে বিছানায় শুয়ে বইখানা খুললেন।

—"মামা, জেগে আছো ?…মামা ?"

বলতে-বলতে ভেজানো দরজা ঠেলে প্রবেশ করলে কৃষ্ণা, তার হাতে একখানা খোলা পত্র, মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন !

বইখানা পাশে রেখে দিয়ে প্রণবেশ আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, কৃষ্ণা ?"

কৃষ্ণা বললে, "এই দেখ, কি অদ্ভুত একখানা চিঠি এসেছে। নাঃ, যত-সব ভেজাল বাপু, একেবারে জ্বালিয়ে খেলে! এত-টুকু সুখ-শান্তি যদি পাওয়া যায়!"

কথা না ব'লে প্রণবেশ তার হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে পড়তে সুরু ক'রে দিলেন; কৃষ্ণা ব'লে চললোঃ "পারবো না ইচ্ছে করলেই হয়না, মামা,—কোথা থেকে ফ্যাসাদ আসে দেখ। এই যে আমার পড়াশুনো—এসব এবার শিকেয় তুলতে হবে, নইলে দেখছি নিস্তার নেই। এখন ভাবছি, কেনই-বা মরতে সখের গোয়েন্দাগিরি করতে গেলুম,—হলো বটে লোকের উপকার, কিন্তু এর 'ম্যাও' সামলাতে আমার যে প্রাণ যায়!"

প্রণবেশ বিরক্তকণ্ঠে বললেন, "চিঠিখানা আগে পড়তেই দাও বাপু, তারপরে যত পারো কথা বলো—"

প্রণবেশের পড়ায় যে কতটা সময়ক্ষেপ হয় তা অনুমান ক'রে কৃষ্ণা চুপ করলে। সে তাকিয়ে রইলো মামার মুখের দিকে।

পড়তে-পড়তে প্রণবেশের মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠলো। প্রায় দশ মিনিট তিনি একাগ্রমনে পত্রখানা পড়লেন, তারপর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন—"উঁহু, বড় জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে কৃষ্ণা, এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো।"

প্রণবেশের সামনা-সামনি চেয়ারখানায় ব'সে কৃষ্ণা বললে, "কিন্তু, আশ্চর্য্য দেখেছো মামা, তোমাদের সঙ্গে আবার এদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, মায়ের সেই সম্পর্ক ধ'রে এই মেয়েটি আমার মাসী হন্ বলতে পারো। কিন্তু কই মামা, কোনদিনই তো তোমাদের মুখে এই বোনটির কথা শুনিনি বাপু!"

প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, "আমিও এঁদের বিশেষ চিনিনে, কৃষ্ণা। তবে বাবার মুখে একবার শুনেছিলুম, তাঁর এক ভাই নাকি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় চলে যান, তারপর অনেক সন্ধান করেও তাঁরা সেই ভাইয়ের কোনো খোঁজ পাননি। এখন এই চিঠিখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি আগে মালয়ে, পরে আসামের ল্যাংটিংয়ে ছিলেন এবং সেখানেই বিবাহ ক'রে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরই এই মেয়েটি বিপদে প'ড়ে তোমায় পত্রপাঠ যাওয়ার জন্যে লিখেছে, এই তো?"

কৃষ্ণা বললে, "হ্যাঁ, পড়লে তো, এর ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ পিতাকে ওদের শত্রুরা বন্দী ক'রে রেখেছে···পুলিশের সাহায্য নিয়েও তাঁকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি, সেইজন্যে আমার

সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি, এ-মেয়ে আমাকে চিনলে কি ক'রে! আমি যে মাঝে-মাঝে সখের গোয়েন্দাগিরি করি তাই-বা জানলে কি-ভাবে, অবাক হয়ে শুধু সেই কথাই ভাবছি।"

একটু হেসে প্রণবেশ বললেন, "খবরের কাগজের মারফতে তুমি যে কতখানি বিখ্যাত হয়ে পড়েছো, তা তো জানো না, কৃষ্ণা! মাকড়সার মত আপনার জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও, বাইরের জগৎ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে। তারপর এই কিছুদিন আগে মিঃ সেনের মামলায় * তোমার নামটা আরও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। যাক্, এখন কি করবে তাই বলো দেখি?"

বিকৃতমুখে কৃষ্ণা বললে, "আমার চেয়ে সে ভাবনা তোমারই করা উচিত মামা। তোমার কাকা...তাঁর মেয়ে...বিশাল সম্পত্তিও যে সঙ্গে নেই তাই-বা কে বলতে পারে? মেয়েটি, মানে, তোমার এই বোনটি যে খুব বিপদে পড়েই এ চিঠি লিখেছে এটা তো বুঝছো!"

লজ্জিত প্রণবেশ ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ, বুঝেছেন তিনি।

কৃষ্ণা হাতের পত্রখানা নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, "যাক্, ঘুরেই আসা যাক্—কি বলো, মামা? বেশীদূর তো নয়; মানে, তোমার-আমার কাছে পথের দূরত্ব বেশী নয়। আর, আমার চেয়ে তোমারই আপনার লোক তো বটে!"

---

* এই লেখিকার 'হত্যার প্রতিশোধ' দেখুন।

প্রণবেশ বাধা দিলেন, রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "ও-কথাটি বলো না, কৃষ্ণা। দেখছো তো এ মেয়ে বাঙালী নয়, নাম রয়েছে—রুমা। কোন্ জাত তাও জানিনে, তবু আমাকে তার নামগোত্র বলতে হবে এ হতেই পারে না। কোথাকার কে পথের মেয়ে, কোন্ একটা হারাণো সম্পর্ক ধ'রে কিনা—"

রাগে-রাগে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

তাঁর রাগ দেখে কৃষ্ণা হাসে, বলে, "যাক্গে, ধরলুম তোমার কেউ নয়, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি অসহায় মেয়ে; তার বৃদ্ধ পিতা শত্রুর হাতে বন্দী, কেবল এইজন্যেই আমি তার কাজ করতে যাবো। মেয়েদের বিপদে মেয়েরা না দেখলে কে দেখবে বলো? সেইজন্যেই আমার যাওয়া উচিত, তাছাড়া যখন এসব ব্যাপারের কিছু-কিছু আমার জানা আছে।" একটু থেমে সে বললে, "কাল সকালেই তুমি বরং দু-খানা টিকিট ক'রে নিয়ে এসো মামা, দেরী কোরোনা। সামনে পূজোর ছুটি আসছে, একদিন বাদেই কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে, ছুটির অবকাশটা নাহয় ওধারটায় কাটিয়ে আসা যাবে—কি বলো?"

এ-প্রস্তাবে প্রণবেশ মোটেই খুশী হলেন না। পূজার আনন্দটা যে তিনি বাংলার বাইরে গিয়ে নষ্ট করতে চান না, সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়; বললেন, "পূজোটা বরং কেটে যাক্, তারপর একদিন রওনা হলেই হবে, না কি বলো, কৃষ্ণা?"

হাতের পত্রখানার উপর চোখ রেখে কৃষ্ণা বললে, "দেরী করেই-বা লাভ কি, এখন গেলে, এ-মাসের মধ্যেই আবার ওখানকার কাজ সেরে ফিরে আসতে পারবো।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রণবেশ বললেন, "পূজোর সময়টা কলকাতার বাইরে যেন কেমন-কেমন লাগে!"

কৃষ্ণা বললে, "কি যে বলো মামা! আচ্ছা, তোমার বয়েস কত হলো বলো তো? আজও কি ছেলেমানুষ আছো, যে, পূজোর সময় নতুন জামা-কাপড় প'রে নেচে বেড়াবে? না না, ও-সব ছেলেমানুষি চলবে না মামা, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হও, নইলে কেউ তোমায় মানবে না। যাক্, কাল সকালেই কিন্তু টেলিটা ক'রে ফেলো, কলেজ বন্ধ হলেই আমরা পরশু রবিবারে রওনা হয়ে যাবো।"

সে উঠে দাঁড়ালো।

মুখখানা কাঁচু-মাচু ক'রে প্রণবেশ বললেন, "রবিবার না গিয়ে, সোমবার গেলেই তো হয়।"

কৃষ্ণা ফিরে দাঁড়িয়ে, বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, "কেন, রবিবারে তোমার কোনো জরুরী কাজ—মানে, তোমাদের ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন নাকি ?"

প্রণবেশ ব্যায়াম-সমিতির একজন সভ্য। গোপনে-গোপনে তিনি যে শক্তি-চর্চ্চা করেন, কৃষ্ণার পরিহাসের ভয়ে তিনি এ-কথা কৃষ্ণাকে জানান নি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণা সে-কথা জানতে পেরেছে।

লজ্জিত প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, "না-না, তা ঠিক নয়, কথাটা হচ্ছে—রবিবার নিষ্ফলা বার কিনা…"

—"নিষ্ফলা বার !"

কৃষ্ণা হেসে উঠলো।…"নাঃ, পাঁজি-পুঁথিও দেখতে শিখেছো মামা, এবার হাঁচি-টিকটিকি, কাশি-হাসি-কান্না সব-কিছুই মানবে, আর আমাকেও মানাবে দেখছি। ওসব আশ্চর্য্যি বিধান একালে চলবে না, মামা…নিষ্ফলা হলেও আমার অধ্যবসায়ে আমি ওই নিষ্ফলা-বারটাকেই সফলা ক'রে তুলবো। তুমি বাপু আর ফ্যাকড়া তুলো না, এখন একটু স্বস্তিতে কাজ করতে

দাও আমায়।” বলেই বেরিয়ে যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিতে-দিতে আবার বললে, “ও ডিটেকটিভ-উপন্যাসখানা আজ তুলে রেখে দাও মামা, এখন মাথা ঠাণ্ডা ক’রে ঘুমোও।”

তারপর আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

দুই

এত জায়গা থাকতে মায়ের কাকা যে আসামে গিয়ে পড়লেন কেন,‟ আর সেখানেই-বা সংসার পেতে বসলেন কিজন্যে, কৃষ্ণা বুঝতে পারে না।

কিছুকাল আগে বিশেষ কাজের জন্যে তাকে একবার আসামে যেতে হয়েছিল। আসামের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত দু-দিনের জন্যে ভালো লাগলেও, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা যায়না বলেই তার বিশ্বাস।

ট্রেনে ব’সে সে আর-একবার পত্রখানা পড়লে।

পত্রখানা পোষ্ট হয়েছে—গৌহাটী থেকে। পত্রের ভিতরে এক কোণে গ্রামের নাম দেওয়া আছে—‘[illegible]’, তার নীচে তারিখ দেওয়া। তারিখ দেখে বোঝা যায়, এ-পত্র লেখা হয়েছে, আজ থেকে ঠিক ঊনিশ দিন আগে।

অপরিচিতা মেয়েটি লিখচে ঃ

'প্রথমে এই পত্রখানা হাতে পড়লেই ভাববে, কে ইনি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমি অপরিচিতা নই! তোমার মা আমার দিদি ছিলেন, সে-হিসাবে আমি তোমার মাসিমা।

আমার বাবা ভবতোষ চৌধুরী, তোমার মায়ের নিজের কাকা। ভাগ্যদোষে তিনি আজ এখানে তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে, এখানকার পুলিশ অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-সন্ধান পায়নি। জানিনা এ পত্র তোমার কাছে পৌঁছোবে কিনা, কারণ, আরও যতবার এমনি ভাবে পত্র দিয়েছি, কোনো পত্রই আমার বিশ্বাসী কেউ পোষ্ট করেনি। আজ পাঁচ টাকা পাবার লোভে একটি গরীবের ছেলে এ-পত্র ডাকে দেবে বলেছে। যদি এ-পত্র পাও, একটুও দেরী না ক'রে পত্রপাঠ চলে আসবে। গৌহাটীতে নেমে, ব্রহ্মপুত্রে নৌকায় আসতে হবে —ওখানে খোঁজ করলে এ-জায়গার সঠিক বিবরণ জানতে পারবে, আসা মুস্কিল হবেনা। ট্রেনের পথ নয়, মোটরে আসা চলে, কিন্তু মোটর নিতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে, আমায়

হয়তো এরা সরিয়ে ফেলবে এখান থেকে। তোমরা নৌকা-পথে এসো। কাছারী-ঘাট থেকে দক্ষিণে চার মাইলের বেশী হবে না। এলে সব বলবো। —হতভাগিনী রুমা।'

প্রণবেশ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন...ট্রেন আমিন-গাঁওয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে...ষ্টিমারে ওপারে পাণ্ডুতে পৌঁছে আবার ট্রেনে গৌহাটী যেতে হবে।

পত্রখানা ভাঁজ ক'রে রেখে কৃষ্ণা মুখ তুললে। সন্ধ্যা হতে এখনো দেরী আছে। ট্রেন যত এগিয়ে চলে, দূরের পাহাড়শ্রেণী ততই কাছে আসছে দেখা যায়।

এদিককার ষ্টেশনের ব্যবধান বড় বেশী। কৃষ্ণা যখন পত্র পড়ছিল, সেইসময় একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতে, কত লোক নেমে গেছে, উঠেছেও কয়েকজন, কৃষ্ণার তখন সেদিকে খেয়াল ছিল না। এখন পত্রখানা রেখে দিয়ে মুখ তুলতেই সামনে সে যে-লোকটিকে দেখতে পেলে, তার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না।...দীর্ঘ দেহ, গায়ের রং তামাটে, একটা চোখ নেই, চোখের সাদা অংশটা শুধু উঁচু হয়ে উঠেছে। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে আছে, পানের ছোপে সেগুলো লাল হয়ে গেছে, সমস্ত মুখে তার বসন্তের ছোট-ছোট চিহ্ন।

একটা চোখেই সে চেয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে, তার সে দৃষ্টিতে বুকের ভিতরে রক্ত যেন জমাট বেধে যায়, কৃষ্ণা অস্বস্তি বোধ করে।
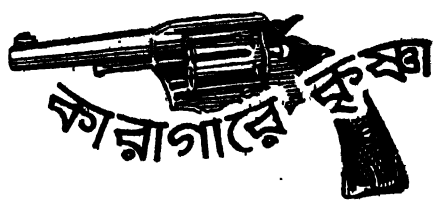
লোকটার গায়ে বার্ম্মিজদের মত ঢিলে জামা, পরনে নীল-ডোরা লুঙ্গি, মাথায় খুব ঘন কোঁকড়া চুল···এক পলকের দৃষ্টিতেই কৃষ্ণা এগুলো দেখে নিলে।

তারপর প্রণবেশের দিকে স'রে ব'সে আর-একবার তাকিয়ে দেখলে, লোকটা ততক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, বাইরের পানে তাকিয়ে আছে···জানলার দিকে খানিকটা সরেও গেছে।

এতক্ষণে ধ্যানমগ্ন প্রণবেশের বাহ্যিক-জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি কৃষ্ণার দিকে ফিরতেই কৃষ্ণা চাপা-স্বরে বললে, "পথে-ঘাটে অতটা আত্মসমাহিত হওয়া উচিত নয়, মামা, বাইরের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক রাখা দরকার।"

প্রণবেশ বলতে যাচ্ছিলেন, "কিন্তু—"

কৃষ্ণা বাধা দিলে, "থাক্ কিন্তু, তার চেয়ে এসো খানিকটা গল্প করা যাক্, টাইমটেবল্‌টা দেখ তো—গৌহাটীতে আমরা পৌঁছোবো কখন ?"

প্রণবেশ টাইমটেবলের পাতা উল্টে দেখে বললেন, "সন্ধ্যের

পরে পৌঁছোবো। কিন্তু তোমার মুখখানা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন! শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

তারপরে কতকটা স্বগতোক্তি করলেন, "তা আর হবে না? ছুটি হতে না-হতে আজ চলো আসাম, কাল চলো সীমান্ত-প্রদেশে, পরশু চলো বিহার, তার পরদিন বম্বে!—একটু বিশ্রাম নেই। শরীর আর কত সইবে!"

কৃষ্ণা হাসে, বলে, "কিন্তু মহাজনের বাণীটা স্মরণ করো, মামা—'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'। সেই মহাজনের নীতি অনুসারে চলো—শরীর হবে লোহার বলের মত, যেদিকে গড়িয়ে দেবে, সেইদিকে চলবে।"

—"তা ব'লে"···প্রণবেশ মুখ তুলে তাকাতেই এক-চক্ষু সেই লোকটির উপর চোখ পড়ে, তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না। সে-লোকটিও তাঁর পানে চেয়েছিল; হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আবার বাইরের দিকে চাইলে।

—"বার্ম্মিজ কিম্বা অসমীয়া।" প্রণবেশ অস্ফুট-উক্তি করেন।

কৃষ্ণা বললে, "যাই হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না, মামা। আমাদের কাছে সবাই সমান। মোট কথা, বাংলার আমদানি নয়, আর মনে হয় যেন পরিচিত···ও-মুখখানা কিছুদিন আগের দেখা। ভোল ফেরালেও চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলেনা।"

সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে বর্ম্মার স্মৃতি—মাতাপিতার মৃত্যু-কাহিনী মনে

প'ড়ে যায়। * নির্দ্দয় দস্যুদের হাতে একদিন তার পিতা-মাতা উভয়েই নিহত হয়েছিলেন; হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে, তবু বেদনা তার বুক হতে মেলায়নি। আসামের পার্ব্বত্য-অঞ্চল আজ তার মনে বর্ম্মার স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিল...স্বর্গগত পিতা-মাতার কথা বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

প্রণবেশ স্নেহের ভাগিনেয়ীর অন্তরের ব্যথা বুঝলেন, তাই হাতখানা সস্নেহে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু মা, বাপ-মা কারও চিরকাল বেঁচে থাকে না এ-কথা তো জানো। আমিও কিছু ভুঁইফোড় ছিলুম না। আমি ছিলুম মায়ের কোলের ছেলে—মা তাই আমাকেই ভালোবাসতেন বেশী। সেই মা যখন মারা গেলেন, আমি বুঝতে পর্য্যন্ত পারলুম না, তাই মরা-মাকেই বার-বার ধাক্কা দিয়ে 'মা ! মা !' ব'লে ডাকতে লাগলুম—"

তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; বললে, "মা যদি

---

* এই লেখিকার "গুপ্তঘাতক" বই দেখুন।

স্বাভাবিকভাবে মারা যেতেন, আমার দুঃখ থাকতো না, মামা। কিন্তু মাকে যে হত্যা করা হয়েছে! বাবাকেও তাই। ডাকাতেরা সবাই প্রায় ধরা পড়েছে জানি, ওদেরই দলের সেই আ-চিন দস্যুটা এতদিন কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল, আজ এই প্রথম ওকে দেখতে পেলুম। আ-চিনও যে আমায় প্রথমে চিনতে পারেনি, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে তা বুঝেছি।—যখনই ও বুঝেছে যে, ওকে চিনতে পেরেছি, তখনই ও চোখ ফিরিয়ে স'রে বসেছে। তাহ'লেও চোখটা কিন্তু ওর এইদিকেই আছে—দেখছো? ও ভাবছে, আমাদের কথার এতটুকু টুকরোও যদি ওর কানে যায়···"

প্রণবেশ সচকিত হয়ে ওঠেন, শশব্যস্তে বলেন, "থাক্ থাক্, আর এসব কথাবার্ত্তায় কাজ নেই বাপু, কে জানে, শুনতে পেয়ে আবার কি ফ্যাসাদ বাধাবে! ওইজন্যেই তো আমি—"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কৃষ্ণা বললে, "ক্ষেপেচো মামা, ট্রেনের যা শব্দ, এতে এক-হাত দূরের কথাও শোনা যায় না। আর আমাদের এসব কথার একটা বর্ণও যদি ও শুনতে পেয়ে থাকে, তবুও—"

পিছনের বেঞ্চে একটা লোক এসে বসায় কৃষ্ণা চুপ করলে, হাতের টাইমটেবল্‌টার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে, "যাক্, আর দেরী নেই, বোধহয় এসে পড়েছে।"

আমিন-গাঁওয়ে ট্রেন থামতেই যাত্রীরা সব নেমে পড়লো।

সামনে ব্রহ্মপুত্র। ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। বেশীর ভাগ

যাত্রী ওপারে যাবে, খুব কম লোকই আমিন-গাঁওয়ে থেকে গেল।

ষ্টীমারে ওঠবার সময় পিছন ফিরে কৃষ্ণা দেখলে, সেই এক-চক্ষু দস্যু আ-চিনও আসছে, সেও সম্ভব ওপারে যাবে।

প্রণবেশ কেবিনের মধ্যে কৃষ্ণাকে বসিয়ে, বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালেন—তারপর রেলিংয়ে ভর দিয়ে সবে মাত্র ব্রহ্মপুত্রের সৌন্দর্য্য দেখছেন, সহসা...

—"বাবু কোনখানে যাবে ?"

চমকে উঠে প্রণবেশ চেয়ে দেখলেন, তাঁর পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে...পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে আরাকানের লোক মনে হলেও, কথা শুনলে তাকে চট্টগ্রামের লোক ব'লে ধরা যায়।

লোক ভুল করেছে হয়তো। প্রণবেশ একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার জলের দিকে চাইলেন। তুফান-তরঙ্গে চঞ্চল কালো জল। এপারে-ওপারে পাহাড়...দিগন্ত-বিস্তৃত কেবল পাহাড়ের শ্রেণী। সেইসব পাহাড়ের গায়ে পটে-আঁকা ছবির মত পাহাড়ীদের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে...চমৎকার দৃশ্য !

লোকটা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, এবারে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কলকাতা থেকে আসচো বাবু? গৌহাটী যাবে, না কামিখ্যে যাবে?"

প্রণবেশ জবাব দিলেন; রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "যেখানেই যাইনা, তোমার সে-খবরে দরকার কি বাপু? তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে! আমার খবরে তোমার দরকারটা কি বলো দেখি?"

লোকটি নিতান্ত নিরীহভাবে হাত কচ্‌লায়, খানিকক্ষণ অ্যাঁ-উঁ ক'রে মাথা চুল্‌কোয়, তারপর বলে, "না বাবু, আমার এমন কিছু দরকার নয়। কলকাতায় আমার ছেলে থাকে কিনা; বড়বাজারের বেহারীবাবু গৌহাটীতে আসবেন, তাঁকে গৌহাটীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ছেলে আমায় চিঠি লিখেছে—আমি যেন আমিন গাঁও থেকে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। সেইজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম বাবু, আমার নিজের কোনো দরকার নেই।"

—"ও।" প্রণবেশ আশ্বস্ত হন। করুণার দৃষ্টিতে লোকটির পানে তাকিয়ে বলেন, "না বাপু, আমার নাম বেহারীবাবু নয়, দেখ গিয়ে আরও জনকয়েক বাঙালী এসেছেন, ওঁদের মধ্যে কেউ যদি বেহারীবাবু থাকেন।"

বাবুর মিষ্টি কথা শুনে লোকটি কৃতার্থ হয়ে অভিবাদন ক'রে অন্যদিকে চলে গেল।

তিন

গৌহাটী পৌঁছেই পরিচিত লোক পাওয়া গেল। প্রণবেশের বন্ধু সুজন মিত্র এখানে পুলিশ-বিভাগে কাজ করেন, ষ্টেশনেই দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল।

—"আরে, প্রণব যে! হঠাৎ এখানে?"

প্রণবেশ থমকে দাঁড়ালো।

সুজন মিত্র যে এখানে বদলী হয়ে এসেছেন নওগাঁ থেকে, তা তিনি জানতেন না। নওগাঁ থেকে তিনি কতবার প্রণবেশকে পত্র দিয়েছেন—প্রণবেশ যদি ওখানে বেড়াতে আসেন, কিন্তু প্রণবেশ বড়-একটা কোথাও যেতে চান না। পত্র দিয়ে-দিয়ে বিরক্ত হয়ে শেষে সুজন পত্র দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, সেইজন্যেই প্রণবেশ জানতে পারেননি যে, সুজন এখানে কাজ করছেন।

প্রফুল্লমুখে তিনি সুজনের প্রসারিত হাতখানা চেপে ধরলেন—"আরে, তুমি এখানে! যাক্, আর ভয় নেই কৃষ্ণা, সুজনের এখানেই ওঠা যাবে।"

—"কৃষ্ণা!" বিস্মিত সুজন পিছনে তাকান্—"তাই তো,

কৃষ্ণাও এসেছে যে। তোমার বিরাট দেহের আড়ালে কৃষ্ণাকে দেখতে পাইনি। যাক্‌, এখন কি মতলবে তুই মামা-ভাগনী হঠাৎ আসামে পদার্পণ করেছো বলো দেখি? বিনা উদ্দেশ্যে যে নয়, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।”

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার করলে, বললে, “উদ্দেশ্যটা পরেই শুনবেন, এখন থাকবার মত একটু জায়গা পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। অজানা দেশ, নির্ভর করবার মত আশ্রয়ের অভাবে শেষে ষ্টেশনেই না রাত কাটাতে হয়!”

স্বজন মিত্র শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, “তাই কখনো হতে পারে, যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে! যদিও আমি থানায় এখন একাই আছি, তবু সেখানেই তোমাদের জায়গা দিতে পারবো, শুধু আজকের জন্যে নয়—যতদিন তোমরা এখানে থাকবে ততদিন স্বচ্ছন্দে আমার ওখানে থাকতে পারবে। তাছাড়া যদি পুলিশের কোনো সাহায্য দরকার হয়, তাও পাবে।”

কৃষ্ণা বললে, “ভগবান হয়তো সেইজন্যেই ষ্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, থানাতেই চলুন, সেখানেই কথাবার্ত্তা হবে।”

সামনেই ঠিকা-গাড়ীর আড্ডা। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক ক'রে প্রণবেশ ও কৃষ্ণা যখন উঠছিলেন, সেইসময় কৃষ্ণা
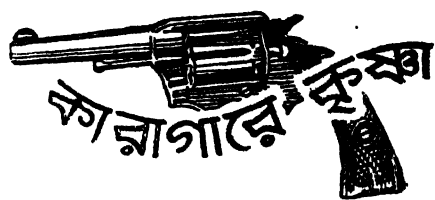
দেখলে, ট্রেনের সেই সহযাত্রীটিও অদূরে একখানা গাড়ী ঠিক করছে।

থানায় পৌঁছে প্রণবেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, স্নানাদি সেরে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন, বুঝেচো, কৃষ্ণা! এবারে অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারা যাবে।"

কৃষ্ণা শূন্য চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, "তিনি যে মঙ্গলময় সে-বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটানোর জন্যে যে আমরা এখানে আসিনি, সে-কথাটাও মনে ক'রো মামা।"

এ-কথা শুনে প্রণবেশ যেন ভাব-রাজ্য থেকে ধূলার ধরণীতে ফিরে এলেন; লজ্জিত-হাস্যে বললেন, "সে-কথা আমার খুব মনে আছে কৃষ্ণা।"

কৃষ্ণা বললে, "সত্যি, একটা অনিশ্চিতের পেছনে ধাওয়া ক'রে এসে, ভগবানের কৃপায় সুজন-মামাকে যে পেয়ে গেছি, এ

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। উনি পুলিশের লোক, নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন,—সেদিক থেকে ওঁর কাছে আমরা অনেক সাহায্য পাবো।”

বাইরে সুজন মিত্রের কথা শোনা যায়। তিনি কৃষ্ণা ও প্রণবেশকে থানায় নিজের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে, তাদের ভার ভৃত্য শামুয়ার হাতে দিয়ে ডিউটিতে চলে গিয়েছিলেন, এইমাত্র ফিরলেন।

—“ঘুমুলে নাকি প্রণবেশ?”

দরজার কাছে সুজন মিত্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণবেশ বললেন, “এত সকাল-সকাল ঘুমের অভ্যেস নেই আমার, তুমি ভেতরে এসো, অনেক কথা আছে।”

ভিতরে আসতে-আসতে সুজন মিত্র বললেন, “এই যে, শামুয়া উপযুক্ত অতিথি সৎকার করেছে দেখছি। এইজন্যেই তো ওকে ছাড়তে চাইনে। শামুয়া?”

হাঁক পাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে অত্যন্ত বিনীত-ভাবে এসে দাঁড়ালো শামুয়া।

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, “রান্না হয়ে গেছে?”

শামুয়া উত্তর দিলে, “জী।”

সুজন বললেন, “ঘণ্টাখানেক পরে সবাইকে একসঙ্গে খেতে দেবে—যাও, এখন বিশ্রাম করো গে।”

হুকুম পেয়েই শামুয়া অদৃশ্য হলো।

কৃষ্ণা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, "একে কোথায় পেলেন সুজন-মামা, এ তো এই দেশেরই লোক দেখছি।"

সুজন বললেন, "সে বড় করুণ কাহিনী, মা! হ্যাঁ, এ-বেচারা এই আসাম অঞ্চলেরই লোক। আমি যখন বদরপুরে কাজ করি, সেইসময় একদিন একে এর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাই। জঙ্গলের ধার দিয়ে আসছিলুম, আমার সঙ্গে ছিল ছু'জন কনেষ্টবল; সেইসময় একটা চীৎকার শুনতে পেয়ে আমি কনেষ্টবল ছু'জনকে নিয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, একে পাঁচ-সাতজন লোক চেপে ধরেছে, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা দড়ির ফাঁস, সেই ফাঁসটা সে এর গলায় পরাবার চেষ্টা করছে, আর শামুয়া প্রাণপণে চীৎকার করছে। ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হলো না। কারণ, এইরকম মৃত্যুর কেস ছুটো আমি হাতে পেয়েছিলুম—সোজা-কথায়, গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা যাকে বলা চলে।"

রুদ্ধশ্বাসে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর ?"

সুজন বললেন, "তারপর রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করতেই লোকগুলো শামুয়াকে ফেলে ছুটে পাহাড়ের জঙ্গলের

মধ্যে কোথায় পালালো…কাছে গিয়ে দেখলুম, বেচারা শামুয়া জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে আছে। তখন কনেষ্টবলদের সাহায্যে তাকে নিয়ে এলুম আমার বাংলোয়, সেই থেকে আজ এই একটা বছর শামুয়া আমার কাছেই আছে।"

কৃষ্ণা বললে, "তাদের সম্বন্ধে শামুয়া কি বললে ?"

একটু হেসে সুজন বললেন, "শামুয়া যা বললে তা আমাদের কাছে আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হলেও, এদের ওসব নিত্যকার ব্যাপার। এদের তোমরা জানো না। এরা একদিক দিয়ে সরল হলেও, অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত বদরাগী। সোজা কথায় যাকে বলে—প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদের মধ্যে দলাদলি খুব বেশী। এই দলগত ব্যাপারে এদের ক্ষতিও বড় কম হয় না। শামুয়া ছিল একটা দলের সর্দ্দার। এই দলকে অন্য দল সহ্য করতে পারতো না—দুই দলে প্রায়ই মারামারি বাধতো। সেই বিপক্ষ দলই একদিন সুযোগ পেয়ে শামুয়াকে ধ'রে ফেলেছিল—আর এইভাবে তাকে হত্যা করবার জন্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "শামুয়ার আত্মীয়স্বজন আছে তো, তারা কোথায় ?"

একটু হেসে সুজন বললেন, "ছিল সবাই, কিন্তু এখন কেউ নেই। মাস-পাঁচেক আগে শামুয়া একদিন ওদের লুকিয়ে নিজের ঘর দেখতে গিয়েছিল, সেখানে দলের একজন লোকের

সঙ্গে দেখা হওয়ায় জেনেছে, তার মা বাপ ভাই বোন, সকলকে ওরা হত্যা করেছে, তার ঘরের চিহ্ন মাত্র নেই।"

প্রণবেশ বিবর্ণমুখে বললেন, "কি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা! তবু তুমি তদের সরল বলো, সুজন ?"

সুজন হাসলেন; বললেন, "সরল বৈকি। আমাদের দেশের লোকের তুলনায় এরা অনেক সরল। এদের সঙ্গে ব্যবহার করলে জানতে পারবে, এরা যেমন প্রতিহিংসা নিতে জানে, তেমনি উপকারীর উপকারও কোনোদিন ভোলে না, প্রাণ দিয়েও এরা এদের উপকারীকে বাঁচায়।"

একটু থেমে তিনি বললেন, "এদের আরও অনেক ব্যাপার আছে, সে-সব কথা পরে শুনো, এখন তোমরা কিজন্যে হঠাৎ গৌহাটীতে এসেছো, ধীরে-সুস্থে এবার সেই কথাটা শোনা যাক্।"

কৃষ্ণা বললে, "বিশেষ কোনো কাজের জন্যেই যে এসেছি, তা তো বুঝতেই পারছেন। ক'দিন আগে হঠাৎ একখানা পত্র পেলুম—একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার মাসিমা হন—বড় বিপদে

পড়েছেন তিনি, যে-কোনোরকমে তাঁকে আর তাঁর বাবাকে উদ্ধার করতে হবে।”

সুজন হেসে ওঠেন—তাঁর হাসি আর থামে না।

প্রণবেশ হুঙ্কার ছাড়েন—“আঃ, থামো, থামো বলছি সুজন, তোমার হাসির শব্দে যে ঘরখানা ভেঙে পড়বে!”

খানিকটা দম নিয়ে একটা সশব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে সুজন হাসি থামান, বলেন, “এখান থেকে তিনি তোমায় খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে…ডিটেকটিভের কাজে খুব নাম ক'রে ফেলেচো দেখছি।”

কৃষ্ণার মুখখানি লাল হয়ে ওঠে, সে একবার প্রণবেশের দিকে তাকায়, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে, “ভুল করছেন। আমি ডিটেক্‌টিভ নই—আত্মীয়তা হিসাবে তিনি আমায় পত্র দিয়েছেন, আর আমিও মামাকে নিয়ে সেইজন্যেই এসেছি। আমার মনে হয়, পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ এত কর্ম্মতৎপর যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কিছু কিনারা করতে পারেনি।”

ফিরিয়ে আঘাত পেয়ে সুজন মিত্রের মুখখানা এবার লাল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, “কেসটা শুনলে আমি বুঝতে পারবো কিসের জন্যে তোমরা এসেছো। প্রণবেশকে বলছি, যদি সে—”

কৃষ্ণা বাধা দিলে—“না, মামার বলার চেয়ে, আমিই

আপনাকে বলছি শুনুন।” ব’লে সে ব্যাগ খুলে নিজের ছোট ডাইরীটা বার ক’রে বললে, “এই আসামে ল্যাংটিং ষ্টেশন থেকে প্রায় দশমাইল দূরে একটা ছোট গ্রামে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বহুকাল থেকে বাস করছিলেন,—এ-অঞ্চলে অনেক-গুলো চা বাগান তাঁর ছিল, তাছাড়া কমলালেবুর ব্যবসায়ও ছিল তাঁর—”

—“রোসো, রোসো!”

সুজন তাড়াতাড়ি উঠে একখানা মোটা খাতা বার ক’রে আনলেন, তারপর টেবিলে খাতাখানা রেখে তিনি তার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায় থামলেন ঃ

—“হ্যাঁ, এইতো লেখা আছে—ভবতোষ চৌধুরী, ইনি কয়েকটা চা-বাগানের মালিক ছিলেন, অনেকগুলি কমলালেবুর বাগানও তাঁর ছিল। হাতীখালিতে তিনি বাস করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যা ছিল তাঁর জীবনের অবলম্বন। মনে হয়, তোমার দাদু ইনিই, আর তাঁর মেয়েটি হচ্ছেন তোমার মাসিমা।”

তিনি কৃষ্ণার পানে তাকালেন।

কৃষ্ণা বললে, "তাঁর চিঠি প'ড়ে তাই তো মনে হয়।"

সুজন নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ ডাইরীর পাতা ওল্টাতে লাগলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করো কৃষ্ণা, আজ তোমরা বড় ক্লান্ত। আমি কাল এ-সম্বন্ধে তোমাদের জানাবো, আর তোমরা যদি সেখানে যেতে চাও তো তোমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।" ব'লে তিনি ওঠবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু একটা কথা ব'লে যান যে, আপনারা তাহ'লে এঁদের ব্যাপার কিছু-কিছু জানেন।"

একটু হেসে সুজন বললেন, "শুধু জানি নয়, আমরা সত্যিই হয়রাণ হয়ে গেছি! এ-কেস আমারই হাতে আছে, তাই বলছি, সুবিধা এতে আমাদের উভয়পক্ষেরই হলো। যে-কোনদিন তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবো, অবশ্য গৌহাটি থেকে অনেকটা দূরে যেতে হবে; লামডিং পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন বদল ক'রে আমাদের যেতে হবে—ল্যাংটিং। সেখানে পৌঁছে, ওখান থেকে দশমাইল যেতে হবে। আমরা হাঁটতে পারলেও, তুমি সেই চড়াই-উতরাই ভাঙতে পারবে না কৃষ্ণা, তা আমি জানি। আবার একখানা ডুলির ব্যবস্থা করতে হবে কিনা—সেটা লামডিংএ পৌঁছে একদিন থেকে করা যাবে।"

—"চড়াই-উতরাই—প্রায় দশমাইল!"

স্থূলদেহ প্রণবেশ একেবারে হাঁপিয়ে ওঠেন।

কৃষ্ণা তাঁর পানে তাকিয়ে হেসে ওঠে, তারপর সুজনের দিকে
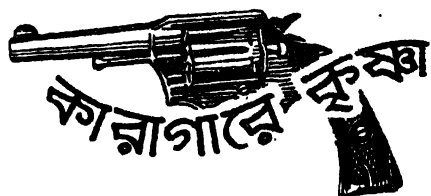
ফিরে বলে, "কিন্তু সুজন-মামা, কেবল একখানা ডুলি করলেই কি চলবে? তাহ'লে মামাকে এখানে রেখে যেতে হয় যে! নইলে আমি খানিকটা হাঁটবো...মামা খানিকটা হাঁটবেন... এমনি ক'রে আমাদের দশ মাইল আর দশ মাইল এই কুড়ি মাইল পথ চলতে হবে।"

—"আবার দশ মাইল!"

প্রণবেশ যেন আকাশ হতে পড়েন..."কি আবল-তাবল বকছিস্ কৃষ্ণা? এক দশ মাইলের ঠেলায় অন্ধকার, আবার দশমাইল এতে তুই যোগ দিচ্ছিস্ কোথা থেকে! এ-দশ মাইল তুই পেলি কোথায়?"

কৃষ্ণা আবার হাসে—"বেশ বলচো মামা। আসবার সময় আবার ওই দশ মাইল আসতে হবে না হেঁটে?"

প্রণবেশ করুণ চোখে সুজনের দিকে তাকান, কিন্তু সুজনের মুখেও হাসি দেখে, লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেন।

সুজন বললেন, "আচ্ছা, সে-সব কালকের কথা কাল হবে, আজ তোমরা বিশ্রাম করো। প্রণব আর আমি পাশের ঘরে

থাকবো কৃষ্ণা, তুমি এই ঘরে থাকো। কিছু ভয় নেই, থানা সুরক্ষিত, বেশ নিশ্চিন্ত-আরামে থাকতে পারবে।"

তিনি অগ্রসর হলেন, প্রণবেশও উঠলেন।

চার

সকালবেলা প্রোগ্রাম ঠিক করার সময় কৃষ্ণা অপরিচিতা মেয়ে রুমার পত্রখানা বার ক'রে সুজনের সামনে ধরলো :

—"আসল এই পত্রখানার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম সুজন-মামা। এই পত্রখানা পেয়েই আমি এসেছি। এতে যে-জায়গাটার কথা লেখা আছে, সেটা আপনারই এরিয়ার মধ্যে পড়ে—এই দেখুন পত্রখানা, একে এই গৌহাটীর কাছেই কোথায় আটক ক'রে রাখা হয়েছে, এখানে যাওয়ার পথের কথাও আছে দেখুন।"

সুজন ব্যগ্রভাবে পত্রখানা পড়তে লাগলেন, কৃষ্ণা দেখতে পেলে—পড়তে-পড়তে তাঁর মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠলো।

পড়া শেষ ক'রে কৃষ্ণার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি গম্ভীর-ভাবে কেবলমাত্র বললেন, "হুঁ।"

কৃষ্ণা পত্রখানা নিয়ে ব্যাগে রাখতে-রাখতে বললে, "আমার মনে হয়, একটু তাড়াতাড়ি এখানে খোঁজ নিতে যাওয়া উচিত! চিঠিখানার তারিখ দেখুন, আজ থেকে ঠিক তেইশ দিন
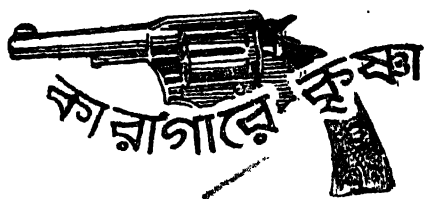
আগে এই চিঠিখানা কলকাতায় পৌঁচেছে, তার দু-তিনদিন পরে আমার কলেজের ছুটি হয়েছে, তারপর আমরা রওনা হয়েছি—”

এবারে সুজন বাধা দিলেন—“অর্থাৎ সোজা কথা এই বলো যে, এতদিন এই মেয়েটিকে দুর্ব্বৃত্তেরা ওখানে রেখেছে কি না। হ্যাঁ, এ-কথা সম্ভব, এঁকে এর মধ্যে ওখান হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। যাক্, এখন আমরা যা খবর পেয়েছি সেটা আগে শোনো। ভবতোষ চৌধুরী ও-অঞ্চলে বেশ নাম-করা লোক। তিনি ল্যাংটিংয়ের ওদিকে কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপন করলেও, থাকতেন বেশীর ভাগ ওইখানে, তাঁর মেয়ে রুমাদেবী ওইখানেই কলেজে পড়তেন।”

কৃষ্ণা অবাক-বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “তিনি কোথায় থাকতেন ?”

সুজন বললেন, “এখানে ভবতোষ চৌধুরী বাড়ী তৈরী করেছিলেন। আমি তোমাদের এখন সেখানে নিয়ে যাবো, বাড়ীখানা তোমরা দেখতে পাবে। রুমাদেবী এখানে বি-এ, পর্য্যন্ত পড়েছিলেন, তাঁর জন্যেই ভবতোষ চৌধুরীকে বেশীর ভাগ

এখানে থাকতে হতো। ইদানিং একবছর তিনি আর ল্যাংটিংএ যাননি, সর্ব্বদা এখানেই থাকতেন। সব বিষয়েই তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী—খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকেই তাঁর উৎসাহ দেখা যেতো। অর্থ ছিল তাঁর প্রচুর, সব দিক দিয়ে তিনি দু'হাতে খরচ করতেন। তাঁর মত লোককে সর্ব্বদা এখানে পেয়ে—"

প্রণবেশ মৃদু হেসে বললেন, "এখানকার লোকেরা বেঁচে গিয়েছিল—কেমন ?"

সুজন উত্তর দিলেন, "তা তুমি বলতে পারো। তাঁর পর্য্যাপ্ত দানই তাঁকে অনেক বড় ক'রে তুলেছিল সাধারণের কাছে। তাঁর বাড়ীতে সর্ব্বদাই লোকজন আসতো, কত দেশের গল্প-আলোচনা চলতো। এরই মধ্যে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন ভবতোষ চৌধুরী নিজেই থানায় এসে হাজির···আমাকে ডেকে চুপি-চুপি বললেন, "এখানে থাকা তাঁর আর পোষালো না—তিনি কাল কিম্বা পরশু কলকাতায় চলে যাবেন। এই দু'একদিনের জন্যে তিনি আমার কাছে জনকয়েক সশস্ত্র পুলিস চান।"

—"সশস্ত্র পুলিস !!"

কৃষ্ণার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—"আপনি দিয়েছিলেন ?"

বেদনার হাসি হেসে সুজন বললেন, "ওপর থেকে অর্ডার না পেলে তো আমি দিতে পারি নে। এ-কথা তাঁকে বলায় তিনি খানিক চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তাঁকে নীরব দেখে আমি জিজ্ঞাসা
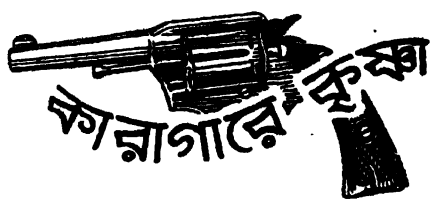
করলুম—'কেন তিনি সশস্ত্র পুলিস চান?' তার উত্তরে তিনি কেবলমাত্র বললেন, "তিনি সর্ব্বদাই জীবনের আশঙ্কা করছেন, কেবল তাঁর নিজেরই নয়—তাঁর মেয়ে রুমার পর্য্যন্ত।"

প্রণবেশ ফোঁস ক'রে উঠলেন, "বেচারা। কিন্তু তুমি এ-কথা শুনেও অর্ডারের অপেক্ষা করলে সুজন, জনকতক পুলিস দিতে পারলে না?"

সুজন মুখ বিকৃত করলেন—"না। কারণ, একটা থানার ভার আমার ওপর, বেশী কনেস্টবল তখন আমার হাতে ছিলনা,—কাজেই সেটা সম্ভব হয়ে উঠলো না। থানায় আমায় কিছু লোক রাখতেই হবে।"

কৃষ্ণা কি ভাবছিল, মুখ তুলে বললে, "তারপর কি হলো?"

সুজন বললেন, "তারপর যা হলো তা আর না বললেও চলে। রাতটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলুম, গত রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা শুধু জিনিসপত্রই নিয়ে যায়নি, সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে গেছে বাড়ীর মালিক ভবতোষ চৌধুরীকেও।"

রুদ্ধশ্বাসে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "আর, রুমাদেবী?"

সুজন বললেন, "রুমাদেবী পুলিসে খবর দিলেন, জোর এন্‌কোয়ারী চললো, কিন্তু ভবতোষ চৌধুরীকে আমরা আর পেলুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রুমাদেবীও হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান করলেন, তাঁরও কোনো খোঁজ-খবর পেলুম না আমরা। রুমাদেবী অনেক কথাই বলেছিলেন, তাঁর কথা যে সত্য তা বিশ্বাস করাবার জন্যেই তিনি হাতীখালি থেকে কাগজপত্র আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে আর ফেরেননি তিনি। শেষটায় আমাকেও যেতে হয়েছিল সেখানে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে।"

শান্তকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, "আমার মনে হয়, এখানে কোনো বিপদাশঙ্কা ক'রে হাতীখালি গিয়ে, তারপর তিনি সেখান থেকে স'রে পড়েছেন। হয়তো এমন কোনো নিরাপদ জায়গাতে তিনি আছেন, যেখানে বিপদের—"

সুজন বললেন, "যেখানে বিপদের আশঙ্কা নেই সেখানে গেছেন বলছো তো? কিন্তু পুলিসের হাতে যখন তিনি এ-ভার দিয়েছেন, পুলিসই তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, এ-অবস্থায় তিনি পুলিসকে না জানিয়ে, একা চলে যেতে পারেন না—অন্ততপক্ষে আমার তাই বিশ্বাস। মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন, তাঁর যে-সব শত্রু অনিষ্ট করছে, তারাই
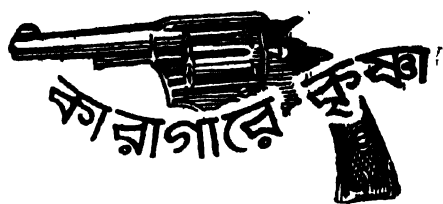
তাঁকে কোনরকমে সরিয়ে রেখেছে, যাতে পুলিস তাঁর কাছ থেকে কোনো সন্ধান না পায়।”

কৃষ্ণা এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না।

প্রণবেশ একটা হাই তুললেন, দীর্ঘ একটা আড়ামোড়া ছেড়ে বললেন, “এরই নাম ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো’। কোথায় সেই কলকাতা,—পূজোর আনন্দে সেখানকার ছোট-বড় সবাই আজ পাগল, আর আমরা কিনা আসামের এই থানায় ব’সে ভাবছি যত-সব অবান্তর কথা—যত সব···”

কৃষ্ণা মুখ তুললে, কঠিন-কণ্ঠে বললে, “আবার সেই পুরোণো কথা। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ফিরে যাও মামা, এত কষ্ট স্বীকার করে যেজন্যে এসেছি তা আমি করবোই। তোমার বোন ব’লে নয়; একটি মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে এই ইচ্ছা নিয়েই আমি এখানে এসেছি।”

একটু হেসে সুজন বললেন, “মাথা খারাপ করো না হে প্রণব, কৃষ্ণার কথা খুব সত্যি। এসে পড়েছো যখন, থেকে যাও।”

প্রণবেশ জানলার দিকে মুখ ক’রে বসলেন। খুশী যে তিনি

মোটেই হননি তা তাঁর গম্ভীর মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

সুজন বললেন, "যাই হোক, কথা কাটাকাটি এখন থাক্, এখনকার যা কাজ তাই হোক। কৃষ্ণাকে নিয়ে আজ আমি একবার ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে যাবো, সেখানে গেলেই কৃষ্ণা অনেক-কিছু জানতে পারবে।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "সে-বাড়ীতে এখন কে আছে?"

সুজন উত্তর দিলেন, "ভবতোষবাবুর অনেককালের পুরোণো চাকর রতন আছে। লোকটা বাঙালী,—বয়স প্রায় ষাট বছর হবে। বহুকাল থেকেই সে ভবতোষবাবুর কাছে আছে, তোমার অনেক-কিছু জানবার কথা তার মুখে শুনতে পাবে। তুমি তৈরী থেকো কৃষ্ণা, আমি বেলা তিনটে-নাগাদ ফিরে তোমায় নিয়ে যাবো।"

প্রণবেশ সবেগে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "তার মানে? তুমি এখন কোথাও বেরোচ্চো নাকি?"

সুজন বিষণ্ণ-কণ্ঠে বললেন—"বেরুতে হবে বইকি। জানোই তো, ডিউটি ইজ ডিউটি,—চাকরি বজায় রাখতে এখনই যেতে হচ্ছে, কারণ কানপুরে ভীষণ একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তার এন্‌কোয়ারী করতে হবে।"

উৎকণ্ঠিতভাবে কৃষ্ণা বললে, "খাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে দুপুরে আপনার?"

সুজন বললেন, "ফিরে এসে যা হয় হবে। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ো, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। আমি তিনটের মধ্যেই এসে পৌঁছোবো।"

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ

যে-সময়ে ফেরবার কথা, তার অনেক পরে ফিরলেন সুজন মিত্র। কানপুরেই স্নানাহার শেষ ক'রে এসেছেন তিনি, এখানে আর কোনো ঝামেলা পোহাতে হলো না।

কৃষ্ণা প্রস্তুত হয়েছিল, প্রণবেশ এর মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন তাই মনটা তাঁর বেশ ভালো আছে। পোষাক ছেড়ে, বসবার ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসতে-বসতে সুজন বললেন, "পুলিসের কাজ সত্যিই বড় ঝকমারির কাজ, নিশ্চিন্ত

হয়ে দু-দণ্ড বসবার যো-টি নেই। রাত দুপুরেও ঘুম ভেঙে উঠে বেরুতে হবে, 'না' বলবার উপায় নেই।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ কি হলো, সুজনমামা?"

সুজন উত্তর দিলেন, "সাংঘাতিক ডাকাতি যার নাম। কাঁনপুরে কমলালেবুর বাগান আছে তো, সেখানকার ম্যানেজার জানকী রায়ের বাড়ীতে এই সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। একজন লোক ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে অনেক পীড়ন করেও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।"

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, "আমি প্রথমে যে সন্দেহ করেছিলুম, ওসব আ-চিনের কাণ্ড—এদের বর্ণনা শুনেও তাই মনে হয়।"

—"আ-চিন্!" কৃষ্ণা একেবারে বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রণবেশ নিজের মাথায় হাত বুলোন,—"আ-চিন্?"

সুজন মিত্র সবিস্ময়ে বললেন, "আশ্চর্য্য তো! তোমরাও আ-চিন্‌কে চেনো দেখছি।"

প্রণবেশ শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "বার্ম্মিজ-ডাকাত আ-চিন্‌কে না চেনে এমন লোক বোধহয় দুনিয়ায় নেই। কৃষ্ণার মা—আমার দিদি আর জামাইবাবু যে বর্ম্মায় নিহত হন তা জানো তো? ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল, পালিয়ে ছিল কেবল ওই আ-চিন্। এখানে আসার সময় আমরা ট্রেনে আমাদের কামরায় তাকে দেখেছি, আমার মনে হয়, এখানে

এসেই সে তার দলবল নিয়ে কানপুরে গিয়ে ডাকাতি করেছে।”

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি চিনলে কি ক'রে আ-চিন্‌কে ? আগে কোনদিন দেখেছিলে না কি ?”

কৃষ্ণা বললে, “না, মামা তাকে চেনেন না, আমি চিনি। বর্ম্মায় থাকতে আমি তাকে দেখেছি, তার কুৎসিত চেহারা একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। এখানে আসবার সময় একটা ছোট ষ্টেশনে সে ট্রেনে উঠেছিল, আমিন-গাঁ পর্য্যন্ত তাকে দেখেছি, তারপর ষ্টিমারে উঠে আর দেখিনি। সে নিশ্চয়ই গৌহাটিতে এসেচে, এখান থেকে দল নিয়ে গিয়ে ডাকাতি করেচে। ওরকম শয়তান খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় সুজনমামা, কোনো বিপদকেই সে গ্রাহ্য করে না। যাক্, ডাকাতি ক'রে সে এবার কি পেলে, জেনেছেন তো ?”

একটু হেসে সুজন বললেন, “তা নিয়েছে অনেক। গত-কাল একটা চা-বাগান বিক্রির মোটা টাকা পেয়েছিলেন, জানকীরাম। টাকাটা আজ ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দেবেন ভেবে, সমস্ত টাকাই

একটা ড্রয়ারে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত-আরামে ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য-সন্ধানী আ-চিন্ দস্যুর গুপ্তচরেরা তাদের সর্দ্দারের কাছে জানকীরামের এই টাকা-পাওয়া আর ড্রয়ারে রাখার সংবাদ যথা-সময়েই পৌঁছে দিয়েছে।"

সুজন পকেট থেকে ডাইরীখানা বার করতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা বাধা দিলে, বললে, "ও-সম্বন্ধে সন্ধ্যার পর আলোচনা করা যাবে সুজনমামা, এখন ডাইরী নিয়ে বসলে আমার কাজ হবে না। আমাকে আপনি আগে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে নিয়ে চলুন, তারপর আপনার বিশ্রাম।"

সুজন আবার হাসলেন, বললেন, "বিশ্রাম কথাটা আর বোলোনা কৃষ্ণা, বিশ্রাম আমার জীবনে মিলবে কিনা জানিনে। রুমাদেবীর এই কেস নিয়েই গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছি, এর মধ্যে এসে জুটলো আবার ডাকাতি-কেস! উপরওলার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে প্রাণান্ত হচ্ছে! যাক্ সে কথা, তোমাকে নিয়ে যাই চলো, দেখি যদি তুমি ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারো!"

সুজনের সঙ্গে কৃষ্ণা এগিয়ে চলে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রণবেশ যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করেন, "ওঁদের বাড়ীটা এখান থেকে কতদূর?"

সুজন বললেন, "যত দূরই হোক না, মোটরে যাবে-আসবে, বিশেষ কষ্ট হবে না।"

একখানা জিপে উঠলেন তিনজন।

ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁসে ওই সুন্দর বাংলোটি দূর থেকে দেখলে একখানি ছবি মনে হয়। বাংলোর তিনদিকে ফুলের বাগান, সামনে খেলার লন।

গেটের সামনে একজন কনেষ্টবল পাহারা ছিল, সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে সে গেট খুলে দিয়ে স'রে দাঁড়ালো, সুজন জিপখানা ভিতরে নিয়ে গেলেন। লাল টালি-ছাওয়া বারান্দার নিচে গাড়ী দাঁড়াতেই সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়ালো একটি বৃদ্ধ। সুজনের মুখে শোনা গেল, এরই নাম রতন, ভবতোষবাবুর অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য।

কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে, জিজ্ঞাসুনেত্রে সে সুজনের দিকে চাইলে। সুজন পরিচয় দিলেন, "এঁরই নাম কৃষ্ণাদেবী, যার কথা তোমায় বলেছিলুম। বাংলাদেশে এঁর প্রচুর নাম। বয়সে ছোট হলেও এই মেয়েটি ডিটেকটিভের কাজে এমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, যা নামজাদা গোয়েন্দারাও অনেক সময় পেরে ওঠেননি।"

কৃষ্ণা লজ্জিত হয়ে ওঠে, সুজনের কথার মাঝখানে বাধা দেয়, বলে,—"না না, তুমি সুজনমামার কথা শুনো না রতন, উনি অনেক বাড়িয়ে বলছেন।"

স্মিতমুখে বৃদ্ধ বলে, "উনি নাহয় বাড়িয়ে বলতে পারেন, কিন্তু রুমা-মাও তো তোমার কথা বলেছিলেন, মা! তোমার ঠিকানা অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। তারপর রুমা-মা যখন ল্যাংটিং গেলেন, সেইসময় হঠাৎ ঠিকানা পাওয়া গেল।"

সকলে ঘরে ঢুকলেন। উৎসাহিত হয়ে কৃষ্ণা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে বললে, "আগে আমায় সব কথাগুলো বলো তো রতন, খাপছাড়া ভাবে শোনার চেয়ে প্রথম থেকে শুনলে, পরে আমি অনেক-কিছু জানতে বা করতে পারবো যাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।"

রতন খানিকটা চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে, "সে যে মস্ত বড় গল্প হয়ে যাবে, মা!"

কৃষ্ণা বললে, "তবু তার মধ্যে থেকেই আমার যা জানবার তা জেনে নিতে পারবো।"

রতন বললে, "সবই বলবো, এখন আগে আপনারা চা খান, চা এনে দিই।"

বাধা দেওয়ার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সুজন ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, "রুমাদেবীর মুখে যতদূর শুনেছি, তাতে রতনকে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়। তাছাড়া

বহুদিনের লোক, বয়সও অনেক। এ-বয়সে লোকে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

প্রণবেশ সন্দেহজনক হাসি হাসলেন, বললেন, "আমি যদি পুলিসে কাজ করতুম, আগে এই রতনকেই গ্রেপ্তার করতুম।"

কৃষ্ণা বললে, "আর সঙ্গে-সঙ্গে ওকে হয় চিরকালের জন্যে জেলে পুরতে, নয় তো ফাঁসিতে লট্‌কাতে—কি বলো মামা? এক-কথায় সব আপদের শান্তি হয়ে যেতো, আমরাও বাঁচতাম, ওরাও বাঁচতো।"

প্রণবেশ উত্তর দিলেন না। মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠলো।

সুজন কি বলতে যাচ্ছিলেন, রতন এসে পড়ায় কিছু বলা হলো না। রতনের একজন আসামী-ভৃত্য এসে চা, বিস্কুট, কেক সামনে সাজিয়ে দিলে।

কৃষ্ণা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, "এসব কি রতন? এত আয়োজন কে তোমায় করতে বললে, শুনি?"

রতন বেদনার হাসি হেসে বললে, "এ তো সামান্যই।

বাবু কি রুমা-মা থাকলে যা করতেন তা যদি দেখতেন! আপনারা সঙ্কোচ করবেন না, আমি খুব অল্পই এনেছি।”

প্রণবেশই সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন দেখা গেল। নিজের ডিস খানা টেনে নিয়ে বললেন, “খাওয়ার নামে আবার চক্ষুলজ্জা। কৃষ্ণা যেন কী! বিকেল হয়ে গেছে, এ-সময় চা না খেলে কোনো কাজে নাকি মন বসে! তুমি ব'সো রতন, কথাগুলো বলো। আমরা ততক্ষণ খেতে আরম্ভ করি।”

রতন একখানা টুল টেনে নিয়ে বসলো।

ছয়

রতন কাহিনী সুরু করলেঃ

বাংলা দেশের এক গ্রামের ছেলে ভবতোষ চৌধুরী।

ছোটবেলা থেকেই খুব ডানপিটে,—লোকের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে ওস্তাদ। এইজন্যে বড় ভাই আশুতোষের সঙ্গে একবার খুব বিবাদ হয় এবং আশুতোষ তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেন।

দারুণ অভিমানে ও রাগে ভবতোষ বাড়ী ছাড়া হয়ে গেলেন ...তারপর নানা যায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে দৈবাৎ রতনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো।

দুজনে মিললো ভালো। দরিদ্র রতনও ভাগ্যান্বেষণে বার হয়েছিল ঘর ছেড়ে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চললেন অজানা দেশের সন্ধানে।

ঘুরতে-ঘুরতে দুজনে গিয়ে পড়লেন সুদূর মালয়ে, সেখানেই তাঁদের অদৃষ্ট ফিরলো।

মালয়ে এক রবারের কারখানায় ভবতোষ কাজ পেলেন। কারখানার মালিক বর্ম্মার লোক, তিনি ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাই বিদেশীয়দের সঙ্গে কারবার করতে খুব অসুবিধা হয়। এখন ইংরেজী-জানা বাঙালী ভবতোষকে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলেন এবং ভবতোষকে এই কাজের ভার দিলেন। ভবতোষ বিদেশীয়দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান ক'রে রবার বিক্রির ব্যবস্থা করতেন তাই তাঁর বেতনও ছিল বেশী। রতন করতো কুলিদের সর্দ্দারী। মালয়ে প্রচুর রবার গাছ জন্মায় এবং সেই উৎপন্ন রবার বিভিন্ন দেশে চালান যায়।

মিঃ আউ-চি লিংয়ের অনেকগুলি বাগান ছিল; কারখানাও ছিল তাঁর অনেকগুলি। ভবতোষ সেখানে থাকতে হঠাৎ একদিন

আউ-চি লিং ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরী হস্তগত করেন।

কিভাবে এই লক্ষ-লক্ষ টাকার বিপুল সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয় তা রতন জানে না। আউ-চি লিংয়ের একমাত্র পুত্র জাও-তুং তখন আমেরিকায় ছিল, শোনা গিয়েছিল যে, সে সেখানে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বিবাহ ক'রে বসবাস করছে। আউ-চি লিং তাকে দেশে ফিরে বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার জন্যে অনেকবার লিখেছিলেন, কিন্তু আসা তো দূরের কথা, সে কোনো পত্রেরই উত্তর দেয়নি।

রতন শুনেছিল, পুত্রের উপর রাগ করেই আউ-চি লিং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এই ভবতোষ চৌধুরীকে দিয়ে গেছেন উইল ক'রে। রতন এতে খুব খুশী হয়েছিল।

কিছুদিন পরে ভবতোষের মুখে সে শুনতে পায়, তিনি এখানে আর থাকবেন না, এখানে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। নিত্য অসুখে ভোগার চেয়ে এখানকার বাগান-কারখানা সব বিক্রি ক'রে দিয়ে ভারতে ফিরে তিনি ব্যবসা করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

এরপর সত্যি-সত্যিই একদিন তিনি সব বিক্রি ক'রে দিয়ে আসামে চলে আসেন এবং লোকজনের ভিড় থেকে দূরে নির্জ্জন স্থান ল্যাংটিংয়ের হাতীখালিতে স্থায়িভাবে বাস করবার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, রতনও তাঁর সঙ্গে এখানে আসে।

মালয়ে থাকার সময় ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার একটি মেয়েকে সেখানকার নিয়মানুসারে বিবাহ করেছিলেন এবং রুমাও সেখানে জন্মেছিল। যখন তাঁরা ল্যাংটিংয়ে আসেন তখন রুমার বয়স পাঁচ-ছ' বছরের বেশী নয়।

ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ে অনেকগুলো চা-বাগান কিনে নিয়েছিলেন। রতন রুমাকে দেখা-শুনা করতো আর চা-বাগান-গুলোর তদারক করতো। রুমার মা ল্যাংটিংয়ে আসবার কিছুদিন পরে মারা যান, তারপর থেকে রুমার ভার সম্পূর্ণ ভাবে রতনের উপর পড়ে এবং সম্পূর্ণ বাঙালীর মতই সে মানুষ হতে থাকে।

বেশ স্বচ্ছন্দে দিন যায়, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা পত্র পেয়ে ভবতোষ বড় বেশীরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

চিরদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও কর্ম্মচারী রতন—তাকে তিনি কোনো কথাই গোপন করেননি। রতন ভবতোষ চৌধুরীর কাছে জানতে পারে যে, দীর্ঘকাল পরে মাও-তুং ফিরে এসেছে, আর দীর্ঘকাল ধ'রে ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান ক'রে সে জানতে

পেরেছে যে, ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ের হাতীখালিতে বাস করছেন। সে জানিয়েছে, শীঘ্রই সে ল্যাংটিংয়ে আসছে, তার পিতার সম্পত্তি কিভাবে ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয়েছে সে সেই কথা জানতে চায়।

এরপর ভবতোষ চৌধুরী আর সাহস ক'রে ল্যাংটিংয়ে থাকতে পারেননি,—তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে তিনি চলে আসেন গৌহাটিতে।

তারপর একদিন এসেছিল মাও-ভুং।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করার পর দেশে ফিরেই সে শুনেছে, বাঙালী ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত ক'রে শেষ এক ইংরেজ কোম্পানীর কাছে সব বিক্রি ক'রে কোথায় চলে গেছেন।

খোঁজ ক'রে সে প্রথমে আসে ল্যাংটিংয়ে, তারপর আসে গৌহাটিতে। এখানে প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয় রতনের, এবং সে ভবতোষ চৌধুরীকে খবর দেয়। বলা বাহুল্য, ভবতোষ চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করেননি এবং দরোয়ান দিয়ে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় মাও-ভুং শাসিয়ে গেছে যে, সে প্রতিশোধ নেবে। তার পিতাকে হত্যা ক'রে অসৎ উপায়ে ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করেছেন, সে নাকি তার প্রমাণ পেয়েছে, এবং অতি শীঘ্র সে ভবতোষ চৌধুরীকে জানিয়ে দেবে যে, বার্ম্মিজরা সরল উদার
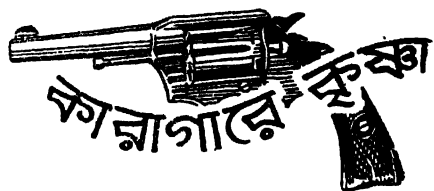
এবং বিশ্বাসপরায়ণ হলেও, প্রয়োজন হ'লে তারা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে।

তারপর বছর-তুই মাও-তুংয়ের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

তারপর একদিন রাত্রে…

ভবতোষ চৌধুরী সেদিন কন্যা রুমা এবং রতনকে বলেছিলেন, তিনি শীঘ্রই কলকাতায় যাবেন। কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর একখানা বাড়ী কেনা হয়ে গেছে। তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি আগেই বাড়ীর কথা লিখেছিলেন এবং টাকাও পাঠিয়েছিলেন; বন্ধু বাড়ী কিনে তাঁকে খবর দিয়েছেন এবং সেই পত্রানুসারে তিনি আগামী সোমবার দিন কলকাতায় যাত্রা করবেন।

প্রস্তাবটা রুমার কাছে ভালো লাগলেও, রতনের মোটেই চিত্তাকর্ষক হয়নি। কতকাল আগে সে বাংলা ছেড়ে চ'লে এসেছে! আজ বাংলায় সে একেবারেই অপরিচিত। তার আত্মীয়স্বজন কেউ বর্ত্তমান নেই, বাড়ী-ঘরেরও অস্তিত্ব নেই। আজ দেশের কেউ তাকে চিনবে না। যেখানে সে আছে, এ-

দেশের ওপর তার একটা মায়া জন্মে গেছে, তাই এখান থেকে সে আর কোথাও যাবেনা।

মনিবকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক নিন্দনীয় কথা শুনলেও সে কিছুই বিশ্বাস করেনা। তার অমতে ভবতোষ চৌধুরী ভিন্ন-জাতের ভিন্ন-দেশের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন—মনে আঘাত পেলেও সে তাঁকে অপরাধী করতে পারেনি; রুমাকেও সে ঘৃণা করতে পারেনি, অপত্য-স্নেহে তাকে বাঙালীর মতই মানুষ ক'রে তুলেছিল।

যে-সোমবার কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন ঠিক হয়েছিল, তার আগের রবিবার রাত্রি থেকে ভবতোষ চৌধুরীকে আর পাওয়া যায়নি। রাত্রে কে বা কারা তাঁর ঘরের জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল এবং খুব সম্ভব, অচৈতন্যাবস্থায় তাঁকে সরিয়ে ফেলেছে। বাড়ীতে অত সতর্ক প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বেমালুম গায়েব হয়ে গেছেন তিনি!

রুমা সকালেই পুলিসে খবর দেন এবং তদন্তে আসেন ইনি, এই সুজন মিত্র। এই তদন্তের জন্যেই সুজন মিত্রের সঙ্গে রুমা হাতীখালি গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে তিনি আর ফেরেন্‌নি। সেই থেকে রতন যক্ষের মত এ-বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। যতদিন তাঁরা না আসবেন রতনের নিষ্কৃতি নেই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতন চোখ মোছে।

সাত

সুজনের কাছে শোনা যায়, পরদিনই রুমা দেবীকে নিয়ে তাঁর গৌহাটী ফিরে আসবার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বড়সাহেবের কাছ থেকে জরুরী 'তার' পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই রাত্রেই ফিরতে হয়েছে। রুমাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি চারজন কনেষ্টবলকে হাতীখালিতে রেখে আসেন। এখানে এসে আশ্চর্য্য হয়ে যান্ যে, সাহেব তাঁকে 'তার' করেননি।"

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বললে, "সে আমি আগেই বুঝেচি সুজনমামা, এ শুধু শত্রুর একটা চাল। আপনি নিজে পুলিসের লোক, চিরকাল এরকম ঘটনা দেখে আসচেন, তবু ওদের ছলনায় ভুলে···আশ্চর্য্য!"

এ-কথায় সুজন যে একটু অসন্তুষ্ট হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল; তিনি বললেন, "হ্যাঁ, চিরকাল দেখে আসছি, কিন্তু তবু বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো কৃষ্ণা, কারণ, সাহেব এখানে না থাকায় আমি তাঁকে জানিয়ে যেতে পারিনি, অথচ কতকগুলো

জরুরী রেকর্ড আমার জিম্মায় ছিল। 'তার' পেয়ে আমি ভাবলাম, সাহেব ফিরেছেন, আর সেই রেকর্ডগুলো তাঁর তখনই চাই। সেই-জন্যেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম।"

কৃষ্ণা বললে, "তারপর আপনি কবে জানলেন যে, রুমা-দেবীকে পাওয়া যাচ্চেনা ?"

সুজন উত্তর দিলেন, "তার পরদিন সকালের ট্রেনে আমি সেখানে গিয়ে কনেষ্টবলদের মুখে শুনতে পেলাম, সন্ধ্যার সময় রুমাদেবীর সঙ্গে কে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল, সেই লোকটা চলে যাওয়ার পর রুমাদেবী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে দাসদাসী সকলকে হুকুম দেন যে, রাত্রে যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। সকালবেলা দেখা গেল, তাঁর ঘরের দরজা খোলা…তিনি নেই !"

কৃষ্ণা খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর উঠে বললে, "আপনারা বসুন, আমি রতনের সঙ্গে একবার বাড়ীটা ঘুরে দেখে আসি।"

প্রণবেশ একটু হেসে বললেন, "বাড়ীতে কিই-বা পাবে কৃষ্ণা ! তার চেয়ে আমার মনে হয়, হাতীখালিতে গেলে বোধহয় কিছু সন্ধান পাওয়া যেতো।"

সুজন বললেন, "কৃষ্ণা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, পুলিস তদন্ত করতে কিছু কম করেনি। এখনও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি, আর ফল যে হবেই এ-বিশ্বাসও রাখি, তবু—"
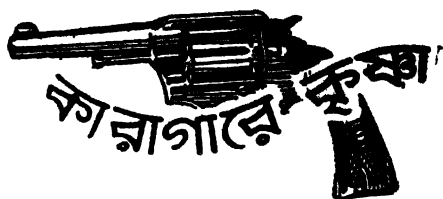
কৃষ্ণা বাধা দেয়, হাসিমুখে বলে, "তা আমি জানি সুজন-মামা, রুমাদেবীর কেস্‌টার কিনারা করতে পারলে আপনার নাম হবে বড় কম নয়। আপনি যথেষ্ট করচেন, আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে একবার দেখি না কেন, তাতে হয়তো আপনারও এতটুকু সাহায্য হবে।"

ব'লে হাসিমুখেই সে রতনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সুন্দর সুসজ্জিত ঘরগুলি গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। দেখে বোঝা যায়, ভবতোষ চৌধুরী মনের মত ক'রে বাড়ীটিকে তৈরী করিয়েছেন, আর পছন্দসই ক'রে সাজিয়েছেন রুমাদেবী; সে-কথা রতনের মুখে শোনা গেল।

রতনের মুখে কৃষ্ণা আরও শুনলে, রুমাদেবী এখানে পড়তেন। এই ঘরে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বড় শান্ত মেয়ে—এখানে তাঁকে কারও সঙ্গে মেলা-মেশা করতে দেখা যায়নি, বন্ধু-বান্ধব তাঁর কেউ ছিলনা।

এই কথাবার্ত্তার মধ্যে বাগানের দিকে খোলা জানলা-পথে

একটা মুখ কৃষ্ণার পানে বারেক তাকিয়েই সহসা সরে গেল। কৃষ্ণার কিন্তু চোখ এড়ালো না। সে জিজ্ঞাসা করলে—"জানলা দিয়ে উঁকি দিলে কে রতন! এখানে কোনো মেয়ে আছে কি?"

রতন উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, ওর নাম সুমিয়া—মালয়ের একটি মেয়ে, মাস তিন-চার হলো এখানে এসেছে। রুমা-মায়ের দেশের লোক—ওঁর মায়ের বিশেষ পরিচিত। এখানে আসার পরে চৌধুরীমশাই ওকে রাখতে চান্‌নি, কিন্তু বোবা-কালা মেয়েটা কোথায় যাবে, তাই রুমা-মা ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।"

—"বোবা-কালা! বলো কি?" বিস্ময়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে।

রতন বললে, "হ্যাঁ, কানেও শোনেনা, কথাও বলতে পারেনা, তবে, ভাবে-ভঙ্গিতে অনেক-কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে।"

কৃষ্ণা বললে, "ওকে একবার ডাকতে পারো রতন? একবার ভালো ক'রে দেখি…আলাপ-পরিচয় করি।"

—"ডাকচি।"

রতন বাইরে চলে যায় এবং পরক্ষণেই একটি কালো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে; বলে, "এই সুমিয়া। বয়স এর খুব বেশী নয়, আমাদের রুমা-মায়ের বয়সী হবে। বেচারা—মানুষ হয়েও অমানুষ—বোবা, কালা, জগতের কিছুই জানলে না।"

কৃষ্ণা সুমিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে; তারপর জিজ্ঞাসা করে—"তুমি সুমিয়া, মালয়ের মেয়ে?"

সে নিঃশব্দে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে কেবল হাসে, সাদা-সাদা বড়-বড় দাঁতগুলো তার আমূল বেরিয়ে পড়ে। কৃষ্ণা যত কথা ব'লে যায়, সে শুধু অ্যাঁ-উঁ শব্দ করে আর হাসে···

কৃষ্ণা হতাশ হয়ে পড়ে, তবু তার মনের সন্দেহ যায়না। এই মেয়েটির হঠাৎ এ-বাড়ীতে আসাটাই যেন কেমন সন্দেহজনক মনে হয়। ভবতোষ চৌধুরী মালয় থেকে বহুকাল আগে চলে এসেছেন, সেখানকার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই এখন। কোন্‌কালে তিনি মালয়ে ছিলেন, সেই সম্পর্ক ধ'রে মালয়বাসিনী সুমিয়ার এখানে আসা সত্যিই সন্দেহের কারণ ব'লে মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা সুমিয়াকে বিদায় দিলে। সে যেমন এসেছিল, তেমনি ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকিয়ে রতন আর কথা বলবার সাহস পায়না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "সুমিয়া কি কোনোদিন হাতীখালিতে গেছে, রতন ?"

রতন মাথা নেড়ে বললে, "না। ও আসার পর বাবু কি

রুমা-মা, হাতীখালি যান্‌নি। বাবু যাওয়ার পর রুমা-মা সুজন বাবুর সঙ্গে গিয়েছিলেন, সুমিয়া তখন এখানেই ছিল।"

কৃষ্ণা বললে, "সুমিয়া এখানে আসার পর কোনোদিন কোনো লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি?"

রতন চিন্তা করে, তারপর মাথা নাড়ে "কই, না। কেউ তো কোনদিন আসেনি।"

একটু থেমে সে কি মনে ক'রে বললে, "কিন্তু মনে হয়, মেয়েটা যেন লেখাপড়া জানে।...তা হতেও পারে, বোবা-কালাদেরও তো ইস্কুল আছে, সেখানে হয়তো পড়েছে।"

—"পড়তে পারে?" ব'লে কৃষ্ণা রতনের পানে তাকালে।

রতন বললে, "বোধহয় পারে। ওকে মাঝে-মাঝে বাবুর ইংরিজি কাগজ যা আসতো তা পড়তে দেখেছি। হতে পারে—মালয়ে ইংরিজি কথাটা খুব চলে তো, কেউ হয়তো ওকে শিখিয়েছিল। হলোই-বা বোবা-কালা, তবু ওইটুকুই যে শিখতে পেরেছে, সেও তো সাহেবদেরই দৌলতে। যাই বলো মা, সাহেবরা আমাদের দেশে এসে যত-যাই করুক, উপকারও বড় কম করেনি।"

কৃষ্ণা শুধু হাসলে, কোনো উত্তর দিলেনা।

উৎসাহিত রতন আরও কথা বলতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণার মুখে কোনো কথা না পেয়ে সে দমে যায়...সাহেব জাতের বিশেষ-বিশেষ গুণের কথা আর বলা হয়না।

আট

গৌহাটী পৌঁছে দু'দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে কৃষ্ণা প্রস্তাব করে, "ল্যাংটিং যাওয়া এখন স্থগিত থাক্ মামা, তার আগে আমাদের যেতে হবে, মিয়াংয়ে—যেখান থেকে রুমাদেবী পত্রখানা লিখেচেন। দেখেচেন তো, তিনি লিখেচেন, পত্রপাঠ যেন আমি ওখানে গিয়ে সন্ধান করি। দেরী করলে হয়তো আর তাঁকে ওখানে পাওয়া যাবেনা, অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে।"

চিন্তিত-মুখে সুজন বললেন, "কিন্তু, আমায় যে আজই আবার কানপুর যেতে হচ্ছে কৃষ্ণা, বড় সাহেব নিজে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে আমায় যেতে হবে, বিশেষ এন্‌কোয়ারীতে।"

কৃষ্ণা বললে, "বেশ তো, আপনি কানপুর যাচ্চেন যান, আমাকে একজন বিশ্বাসী লোক দিন, যে নিয়ে যেতে পারে। স্থান নির্দ্দেশ করাই আছে, শুধু পথটা..."

বলতে-বলতে সে ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে রুমা দেবীর পত্রখানা বার ক'রে বললে, "এই দেখুন না, 'কাছারীঘাট থেকে নৌকোয় উঠে, দক্ষিণ দিকে মাইল-চারেক গেলেই এ-জায়গাটা পাবে'।

এমন লোক দিন, যে এ-সব পথ-ঘাট চেনে, জানে। রুমাদেবী ম্যাপ এঁকে দিয়েচেন, শুধু পথ দেখালেই চলবে।"

প্রণবেশ বললেন, "তোমার শামুয়া এ-সব জায়গা বেশ চেনে হে! কৃষ্ণা তাকে বলেছিল···তুমি হুকুম করলেই সে যেতে পারে, বললে।"

সুজন বললেন, "সে যেতে পারে জানি, চিনবেও সব, কিন্তু কথা হচ্ছে, কেবল তাকে নিয়ে সেই অজ্ঞাত স্থানে তোমাদের —বিশেষ ক'রে কৃষ্ণার যাওয়া উচিত হবেনা। আমি সঙ্গে থাকলে তবু চলতো, কিন্তু, ধরো যদি বিপদ ঘটে?"

কৃষ্ণা বাধা দেয়, "কোনো ভয় নেই সুজনমামা, আমি শামুয়াকে নিয়েই যাবো, মামাও সঙ্গে থাকবেন। আমরা বেড়াতে এসেচি মাত্র, কেউ কোনো সন্দেহ করবে না।"

সুজন বললেন, "তবু যদি বলো, নাহয় দু'জন কনেষ্টবল সঙ্গে যেতে পারে।"

প্রণবেশ খুশী-মুখে বললেন, "ঠিক বলেছো, দু'জন কনেষ্টবল বরং সঙ্গে চলুক। ওদের কাছে তো রিভলভার থাকবে, যদিই কোনো বিপদ আসে, ওরা লড়বে।"

শক্ত-মুখে কৃষ্ণা বললে, "ক্ষেপেচো মামা, আমরা বেড়াতে যাচ্চি, সঙ্গে পুলিস থাকলে সবাই সন্দেহ করবে যে! কি দরকার ওসব ক'রে? আমরা এমনি বেড়াতে যাবো, বেড়িয়ে আবার চলে আসবো, এমন তো অনেকই বেড়াতে যায় শুনেচি।"

সুজনকে অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হলো।

শামুয়াকে ডেকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

শামুয়া নৌকো ঠিক ক'রে আসে। তারপর আহারাদি শেষ ক'রে কৃষ্ণা, শামুয়া ও প্রণবেশ কাছারী ঘাটে এসে নৌকোয় উঠে বসেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে নৌকো ভেসে চলে সোজা দক্ষিণ দিকে।

শামুয়া এ-অঞ্চলের সব চেনে। চার-পাঁচ মাইলের দূরত্ব সে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, "ওসব মাইল-টাইল আমি চিনি নে বাবু, মিয়াংয়ের কাছাকাছি নেমে প'ড়ে খুঁজতে-খুঁজতে যাওয়া যাবে-এখন।"

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর শামুয়া থামবার আদেশ করে মাঝিকে—"এখানে নৌকো বাঁধো, এইখানেই নামবো আমরা।"

দুদিকে পাহাড়···মাঝখানে সরু পথ···গ্রামের লোক খুব সম্ভব এই পথে যাওয়া-আসা করে।

শামুয়া এগিয়ে চলে, পিছনে আসেন প্রণবেশ আর কৃষ্ণা।

ছুঁদিককার খাড়া পাহাড়শ্রেণীর পানে তাকিয়ে প্রণবেশের বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। মনে-মনে তিনি কৃষ্ণাকে গালাগালি করেন, মুখে কিছু বলতে সাহস পান্‌না।

কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই পাহাড়ী-পথে চলতে প্রণবেশ রীতিমত হাঁপিয়ে ওঠেন।

তাঁর অবস্থা দেখে কৃষ্ণা মাঝে-মাঝে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর আবার এগিয়ে চলে।

প্রায় মাইল-তিনেক পথ চলবার পর শামুয়া বললে, "এই জায়গার নাম মিয়াং, বাবু।"

অল্প দূরে একটি লোককে এদিকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু এদের দেখে সে পাহাড়ের আড়ালে স'রে যাওয়ার চেষ্টা করবার আগেই কৃষ্ণা তার সামনে গিয়ে পড়ে।

লোকটি অবাক হয়ে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে—কৃষ্ণা তাকে প্রশ্ন করে, কোনো কথারই সে উত্তর দেয়না। প্রণবেশ বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন, "ছেড়ে দাও কৃষ্ণা, মনে হয় লোকটা বোবা-কালা, নইলে তোমার এত কথার একটা উত্তর ও দিতো।"

কৃষ্ণা বললে, "বোবাও নয়, কালাও নয় মামা, লোকটা জানে সব, অথচ কোনো উত্তর দিচ্চেনা, পাছে কোনো কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমি শামুয়াকে দিয়ে ওকে কথা বলাচ্চি দেখ।"

শামুয়া আস্ফালন করে—"যা বলেছেন দিদিসাহেব, পাজির
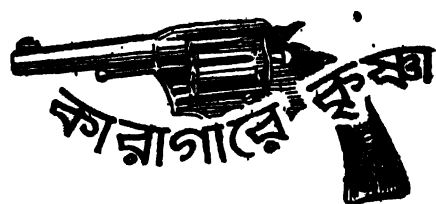
পা-ঝাড়া এই লোকটা। হতভাগাটাকে জব্দ করবার ভার আমায় দিন, আমরা যে পুলিসের লোক তা ও জানেনা, তাই মুখ খুলছে না।”

এই কথা শুনে যে বীভৎস-দৃষ্টিতে লোকটা শামুয়ার মুখের দিকে চাইলে, তাতে শামুয়া একেবারে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সহসা বিকৃত-হাসি হেসে উঠলো, লোকটা। তার সেই অট্ট-হাসিতে চম্‌কে উঠে প্রণবেশ দুই পা পিছনে স’রে গেলেন।

ততক্ষণে লোকটা পাহাড়ের ওধারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রণবেশ শুষ্ক-কণ্ঠে বললেন, “থাক্‌গে, আর দরকার নেই কৃষ্ণা, ফিরে যাওয়া যাক্, কেমন ?”

কৃষ্ণা হাসে, বলে, “তুমি শামুয়াকে নিয়ে নৌকোয় যাও মামা, আমি যা করতে এসেচি তা না ক’রে এক পাও নড়বো না।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণবেশকে তার সঙ্গে যেতে হয়। হাতের রিভলভারটা দেখিয়ে কৃষ্ণা বলে, “ভয় নেই শামুয়া, যতক্ষণ

হাতে রিভলভার থাকবে, কেউ তোমার এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

সঙ্গে যাওয়া ছাড়া শামুয়ার আর উপায় ছিলনা, তাই ছায়ার মতই সে কৃষ্ণার পিছনে-পিছনে রইলো।

জনমানবহীন পথ। মাঝে-মাঝে কেবল দু'একখানা ঘর দেখা যায়, শূন্য অবস্থায় প'ড়ে আছে। শামুয়ার কাছে শোনা গেল—এখানে কিছুদিন আগে কি এক জ্বর এসেছিল, অনেক লোক সেই জ্বরে ভুগে মারা যায়, বাকি যারা বেঁচেছিল তারা জ্বরের ভয়ে পালিয়ে গেছে ঘরের মায়া ত্যাগ ক'রে।

বিফল হয়ে কৃষ্ণা ফিরলো।

বেশ বোঝা গেল, রুমাদেবীকে যারা চুরি ক'রে এনেছিল, তারা এখান থেকে সরে গেছে। কৃষ্ণার মনে হলো, তারা এক-জায়গায় বেশীদিন থাকেনা, পুলিসের ভয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়।

নৌকোয় উঠে শামুয়া একটা শান্তির নিশ্বাস ফেললে, এতক্ষণে তার মুখখানা প্রফুল্ল দেখা গেল। সে কিছু না বললেও কৃষ্ণা বুঝতে পারে যে, আজও শামুয়ার শত্রুরা প্রতিহিংসা ভোলেনি। যারা একদিন শামুয়াকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছিল, মিয়াংয়ের পথে-দেখা সেই লোকটি তাদেরই দলের একজন। অথচ শামুয়া সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনো কথা বলেনা।

নয়

মিয়াং থেকে ফেরবার কয়েকদিন পরের কথা। একদিন ল্যাংটিং ষ্টেশনে নেমে কৃষ্ণা বিস্মিত ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলো।

ছোট্ট ষ্টেশন,—চারিদিকে উঁচু-নীচু পাহাড়ের শ্রেণী··· পাহাড়তলির পাশে এখানে-ওখানে চায়ের বাগান। এ-অঞ্চলটা চা-বাগানের জন্যে বিখ্যাত।

সঙ্গে এসেছেন সুজন।

বন্ধুর দুর্গম পথের কথা ভেবে প্রণবেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কৃষ্ণা তাঁকে আশ্বস্ত করেছে—"থাক্ মামা, তোমায় আর যেতে হবেনা। আমি আজ যাচ্চি, কাল আবার ফিরে আসবো, তোমায় নিয়ে গেলে কাল হয়তো ফেরা হবেনা, দু'চারদিন আবার সেই হাতীখালিতে আমায় থেকে যেতে হবে।"

একদিক দিয়ে খুশী হলেও প্রণবেশ রাগ ক'রে বললেন, "তার মানে? আমি কি তোমার বোঝা হয়ে যাবো, যে, আমার ভার বয়ে তোমায় দু'চারদিন ওখানে বিশ্রাম নিতে হবে?"

কৃষ্ণা সান্ত্বনার সুরে বললে, "কথাটা বুঝতে পারচো না, মামা। হয়তো যাওয়ার সময় ডুলি পাবো, ফেরবার সময় পাবো না, মোটের ওপর হাঁটতে হবেই। পথের মাঝখানে গিয়ে তুমি হয়তো অচল হয়ে পড়বে, তখন উপায় ? তার চেয়ে তুমি এখানেই থাকো,—আরামে থাকতে পারবে, শামুয়া তোমায় হাতে-হাতে রাখবে, এতটুকু কষ্ট পেতে হবেনা।"

বলা বাহুল্য, প্রণবেশ আসেন নি, সুজনের সঙ্গেই কৃষ্ণা ল্যাংটিং রওনা হয়েছে।

সুজন আগে থেকে ডুলির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য-পথে অন্য কোনো যান-বাহন চলতে পারেনা; সুজনের জন্যেও একখানা ডুলি রয়েছে।

এখানকার ডুলি দেখে কৃষ্ণা হাসে।

সুজন বললেন, "পাহাড়ী-দেশের ডুলি এইরকমই হয়ে থাকে কৃষ্ণা, সভ্য-জগতের বার্ত্তা এরা পেলেও, সভ্য-সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। যাই হোক্, উঠে পড়ো ডুলিতে, দেরী করবার দরকার নেই।"

দীর্ঘ দশ মাইল পথ।

বাহকেরা ডুলি নিয়ে কখনো চড়াই ভেঙে উঠচে, কখনো উতরাই-পথে নামছে। পাহাড়ের উপর দূরে-দূরে মিকিরিদের বস্তী দেখা যায়; মাঝে-মাঝে দু-একজন জংলী লোকের সঙ্গে দেখা হয়, বিস্মিতভাবে তারা ডুলির পানে তাকিয়ে থাকে।

পাহাড়ের পাশে-পাশে জঙ্গলে-ভরা গভীর খাদ···কৃষ্ণা ডুলির বাইরে মুখ বাড়িয়ে বাহকদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, বাহকেরা তার কথা বোঝে না।

পিছনে আসতে-আসতে সুজনের ডুলি মাঝে-মাঝে পাহাড়ের বাঁকে আড়াল পড়ে, আবার ঘুরে নিকটে আসে।

চলতে-চলতে সহসা বাহকেরা এক সময় থেমে গেল।

সুজন বাহকদের কি জিজ্ঞাসা করেন এবং তার উত্তরে তারা যা বলে, কৃষ্ণা তা না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারে যে, কোনো বিপদের আশঙ্কায় তারা থেমে গেছে, আর এগুতে চাচ্ছে না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে—"ব্যাপার কি, সুজনমামা, এরা হঠাৎ থেমে গেল যে ?"

সুজন সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখালেন···দূরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সারি-সারি হাতী চলেছে ; বললেন, "ওদিকে আর এগিয়ে যাওয়া মানে, মরণকে ডেকে আনা। ওদের দৃষ্টি একবার এদিকে পড়লে আর নিস্তার নেই, এখনি দলে-দলে ছুটে আসবে···আমাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না।"

কৃষ্ণা অবাক-বিস্ময়ে সেইদিকে চেয়ে থাকে। বর্ম্মা-অঞ্চলের মেয়ে...অনেক জীবজন্তু দেখেছে সে, কিন্তু আসামের জঙ্গল-ভরা পার্ব্বত্য-পথে আজ যেমন সমারোহে হাতীর দল যেতে দেখলে, এ-রকম সে আর কখনো দেখেনি!

দূর থেকে সেই হাতী আর তাদের বাচ্চাদের দেখে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না—অপূর্ব্ব...অ-দৃষ্টপূর্ব্ব...মনোরম!

সুজন বললেন—"এরা এইভাবে মাঝে-মাঝে এইরকম জঙ্গলে চলাফেরা করে। এ-সময়ে সামনে কোনো মানুষ বা জীবজন্তু পড়লে এরা পায়ে চেপে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলে!"

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহকেরা আবার এগিয়ে চললো।

দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের পথ অতিক্রম করবার সময় পরিশ্রান্ত বাহকেরা পথের মাঝে দু-চার বার ডুলি নামিয়ে বিশ্রাম ক'রে নিলে। এমনি ক'রে হাতীখালিতে যখন তারা পৌঁছলো তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

হাতীখালির চারিদিকে চায়ের বাগান, মাঝখানে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ী। আসামের অধিকাংশ বাড়ী যেমন কাঠের তৈরী, এ-বাড়ীটিও তাই। চারিদিক-ঘেরা বিরাট উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ী।

ডুলি থামতেই সুজন মিত্র নেমে পড়লেন, কৃষ্ণাও নামলো।

চারিদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বললে, "ইস্! কি সাংঘাতিক

নির্জ্জন জায়গা! এ-রকম জায়গাতেও মানুষ বাস করে? আশ্চর্য্য!"

সুজন বললেন, "না, একেবারে নির্জ্জন নয়। ওদিকে এই-সব জংলীদের বস্তী আছে, এ-বাড়ীর পেছনদিকে ভবতোষবাবু অনেক ঘর তৈরী ক'রে তাঁর কর্ম্মচারীদের রেখেছেন, আপদে-বিপদে তারাই এঁদের সহায়। ভেতরে চলো, দেখতে পাবে।"

মস্ত-বড় এই বাড়ীর মধ্যে অসংখ্য ঘর। এখানে কেউ না থাকায় সব ঘরই চাবি বন্ধ ছিল। সুজনের কাছে চাবি ছিল, তিনি সামনের ঘরের তালা খুললেন।

তিনি এসেছেন খবর পেয়ে, ভবতোষ চৌধুরীর কর্ম্মচারী ও দ্বারবান-ভৃত্যেরা উপস্থিত হলো।

ম্যানেজার রামশরণ সিং—বিহারের অধিবাসী। শোনা গেল, ইনি ভবতোষ চৌধুরীর পরম বিশ্বাসী ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভবতোষ চৌধুরীর সমস্ত বৈষয়িক-ব্যাপারে ইনি জড়িত, এবং তাঁর এইসব উন্নতির মূলে ছিল রামশরণ সিংয়ের ঐকান্তিক পরিশ্রম।

কৃষ্ণাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। সুজনকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "কাল আপনার 'তার' পেয়ে জেনেছি, আপনি কৃষ্ণাদেবীকে নিয়ে আসছেন। ঘরের চাবি আমার কাছে ছিলনা ব'লে কিছুই পরিষ্কার ক'রে রাখতে পারিনি, তাই আমার ঘরেই ওঁর থাকার ব্যবস্থা করেছি, ইন্‌স্পেক্টার-সাহেব।"

সুজন হাসিমুখে বললেন, "তা আমি জানি রামশরণবাবু; বিশেষ ক'রে, আপনার ভরসাতেই ওকে এখানে আনবার সাহস করেছি। রুমাদেবীর এখান থেকে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করার ব্যাপারটা আমাদের বড় বেশীরকম বিস্মিত করেছে কিনা; তাই এখানে আর-কাউকে আনবার ভরসা করিনি।"

অত্যন্ত বিনীত-কণ্ঠে রামশরণ সিং বললেন, "কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার-সাহেব, আপনি তো জানেন, ব্যাপারটা কি-রকম ভাবে ঘটলো! এত পুলিস পাহারা, আমরা নিজেরা সর্ব্বদা সজাগ, তার মধ্যে এ-রকম একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরাও বড় কম লজ্জিত হইনি। বিশেষ, তিনি আমার মনিব এবং বন্ধুর কন্যা—এ বাড়ী-ঘর সব তাঁরই। নিজের বাড়ীতেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারলেন না—সত্যিই দুঃখের কথা।"

•

সে-রাত্রে কৃষ্ণা কিছুই করতে পারলে না। অজানা দেশ। নিকষ-কালো অন্ধকার রাত। রামশরণ সিংয়ের মহলে একখানা ঘরে তার শয্যা রচিত হয়েছিল। এ-মহলে কৃষ্ণা কোনো স্ত্রীলোককে
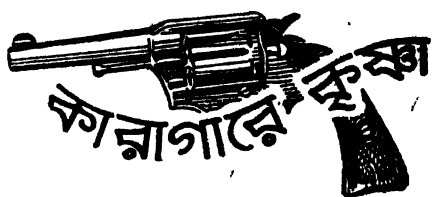
দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার বাড়ীতে কোনো মেয়েকে দেখতে পাচ্ছিনা সিং-সাহেব, কিন্তু মামা বলেছিলেন, মেয়েছেলে আছে। একটু আগেও তো জানতে পারিনি যে, এখানে কেউ নেই—মামাকেও বলেন্‌নি তো?"

রামশরণ সিং বললেন, "ইন্‌স্পেক্টার-সাহেব সেবারে এসে আমার স্ত্রীকে দেখেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছি চিকিৎসার জন্যে, কৃষ্ণাদেবী! আজ দিন তিন-চার হলো তিনি গেছেন। এখনও পৌঁছনো খবর পাইনি। দেখছেন তো, কি-রকম জায়গায় আমরা বাস করছি; ব্যায়রাম হ'লে ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, এক ফোঁটা ওষুধ পর্য্যন্ত আমরা পাই নে, তাই অসুখ-বিসুখ হ'লে এখানে আর থাকা চলেনা।"

কৃষ্ণাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে উপদেশ দিয়ে এবং নিঃশঙ্ক-চিত্তে ঘুমোতে ব'লে রামশরণ সিং বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা দরজা বন্ধ ক'রে খিল দিল।

তারপর আলোটা খুব কম ক'রে দিয়ে, জানলার কাছে

গিয়ে দাঁড়ালো। জানলার খড়খড়ির পাখিগুলো খোলা থাকলেও, ছিটকিনি সে বন্ধ ক'রে দিলে।

রামশরণ সিংকে সে সুজনের মত এক-কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। তার মনে হচ্ছে, এই লোকটি এইসব ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণ-ভাবে লিপ্ত আছে। গৌহাটীর বাড়ী থেকে ভবতোষ চৌধুরীর অন্তর্হিত হওয়া এবং রুমাদেবীর এখান থেকে অকস্মাৎ বিলীন হওয়ার মূলে রামশরণ সিংয়ের সাহায্য সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পাশের ঘরে নাসিকা গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যায়। এ-নাসিকা গর্জ্জন তার পরিচিত। গত রাত্রে গৌহাটীতে সে সুজনমামার নাসিকা গর্জ্জন শুনেছে—দারুণ অস্বস্তিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তার চোখে ঘুম আসেনি।

ওপাশে রামশরণ সিংয়ের ঘরের ঘড়িতে টং টং ক'রে বারোটা বেজে গেল। কৃষ্ণা আস্তে-আস্তে নিজের বিছানায় যাওয়ার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় বাইরের দিকে দরজা খোলার শব্দ কানে আসায় সে আবার ফিরলো।

রামশরণ সিং অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে দিচ্ছেন—নিশ্চয়ই বাইরে কোনো লোক এসেছে। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকে খড়খড়ির রন্ধ্র-পথে।

খোলা দরজা দিয়ে যে লোকটি পা টিপে-টিপে ভিতরে ঢুকলো, সে কৃষ্ণার অপরিচিত নয়। রামশরণ সিংয়ের হাতের টর্চ্চের মৃদু আলোকে কৃষ্ণা তাকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে...
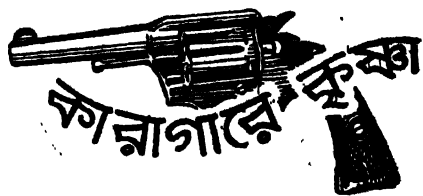
কদম্ব-কেশরের মত সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার···আ-চিন্ এসেছে।

দশ

রামশরণ সিংয়ের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ততক্ষণে কৃষ্ণা নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলে···সুজনকে জাগাতে হবে। যাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই আ-চিন্ এখানে স্বয়ং উপস্থিত। এখনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি মূল্যবান···এইসময় যদি দস্যুটাকে গ্রেপ্তার করা যায়···

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সে হতাশ হয়ে পড়ে। এখানে তাদের সাহায্য করবার লোক কৈ? রামশরণ সিংকে সুজন কোনো-দিনই অবিশ্বাস করেননি। নানারকম কাজের জন্যে রামশরণ সিং প্রায়ই গৌহাটী গেছেন, সুজন মিত্রের সঙ্গে তাঁর আজকের পরিচয় নয়। সুজন স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারেননি, যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর শত্রুপক্ষের লোক ছাড়া আর-কিছু নয়।

তাঁকে বিশ্বাস ক'রে সুজন কৃষ্ণাকে শুধু এখানে নিয়ে এসেছেন নয়,—রামশরণ সিংয়ের গৃহেই আশ্রয় নিয়েছেন।

আ-চিন্ এই মুহূর্ত্তে এখানে এই বাড়ীতে এসেছে সংবাদটা সুজনকে দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কে জানে, বিলম্বে তারও কোনো বিপদ ঘটতে পারে কিনা! আ-চিন্ তাকে চেনে, কৃষ্ণার পিতা-মাতার মত কৃষ্ণাকেও সে আজ হত্যা করতে পারে। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান···কোথায় কি আছে কৃষ্ণার অজ্ঞাত··· কোন্ পথ দিয়ে কোন্ ঘরে পৌঁছে সুজনকে খবর দেবে সে? তাহ'লে?···

মনে পড়েছে। কাল রাত্রে কৃষ্ণাকে নিঃশঙ্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে, রামশরণ গেলেন বাঁদিকে, আর ডানদিকে সুজনমামা। আলোটাকে বাড়াবার চেষ্টা না ক'রে, বিছানার উপর বালিশের পাশে যে রিভলভারটা রেখেছিল, সেটা হাতে নিয়ে সে নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেললে। তারপর খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে···

এই যাঃ! দরজা খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সহসা কে তাকে চেপে ধ'রে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ তার মুখের ভিতর তারই কাপড়ের আঁচল গুঁজে দিলে।

লৌহমানব নাকি? তার শক্ত হাতের নিষ্পেষণ থেকে আত্ম-রক্ষা করবার চেষ্টা করে কৃষ্ণা···চীৎকার করবার উপায় নেই··· তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে সামনের লোকটিকে পদাঘাত করে, একবার···দু'বার···তিনবার···

(কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শক্তিশালী একজন পুরুষের সঙ্গে একটি তরুণী কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে?)

চাপাকণ্ঠে কে আদেশ দেয়—"নিয়ে যাও···পেছনের দরজায় ডুলি আছে···যত শীগগির পারো···তার জন্যে সময় দিলুম দু'মিনিট···"

পরিষ্কার আ-চিনের কণ্ঠস্বর।

নিস্তব্ধে মূর্চ্ছিতার মত প'ড়ে থাকে কৃষ্ণা, তাছাড়া উপায় কি?

আ-চিন্ বললে, "সবুর! সাবধানের মার নেই। মূর্চ্ছার ভাণ ক'রে থাকে তো, সরানোর আগে ওকে ক্লোরোফর্ম্ম ক'রে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ। মনে হয় ওর জ্ঞান আছে।"

রামশরণ সিং বললেন, "না না, আমার মনে হয়, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরকম ক'রে গলা টিপে ধরলে কোনো মানুষের জ্ঞান থাকে না। আমার মতে অনর্থক ক্লোরোফর্ম্ম করা হবে।"

—"অনর্থক?" আ-চিন্ হাসে, বলে, "একে তুমি চেনো না রামশরণ, এ একেবারে জাত-কেউটের বাচ্চা। একবার একটু

ছোবল দেওয়ার সুযোগ পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে জীবনান্ত! একে চিনতে আমার আর বাকি নেই। বাংলা দেশে এই বয়েসে এই মেয়ে যা নাম করেছে, শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ওই ইন্‌স্পেক্টারটাকে আমি একদম গ্রাহ্য করি নে, ওদের দলকে আমি মশা-মাছির মত মনে করি। কিন্তু এ মেয়ে—এর তুমি জুড়ি পাবেনা। মস্ত-বড় গোয়েন্দা এ মেয়ে, একে চেনা সহজ নয়।"

—"গোয়েন্দা!"

রামশরণ সিং আকাশ থেকে পড়েন—"এইটুকু মেয়ে, গোয়েন্দা?"

আ-চিন্ বলে, "হ্যাঁ, মস্ত-বড় গোয়েন্দা। তোমার ঐ ইন্‌স্পেক্টার-সাহেব এর কাছে কিছুই না। যা করছি শুধু দেখে যাও, যদি বাঁচতে চাও তো একটি কথা বোলো না—বুঝলে?"

উগ্র গন্ধটা নাকে আসতেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে। চোখ তার বাঁধা, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেওয়া, চীৎকার করা চলে না, দু-একবার হাত-পা নাড়বার চেষ্টা ক'রে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

কয়েকজন লোকের সাহায্যে আ-চিন্ পিছনের দরজা-পথে কৃষ্ণাকে একখানা ডুলিতে তুলে দিয়ে, রামশরণ সিংয়ের ঘরে ফিরে আসে।

—"হো-হো-হো-হো-হো-হো !"

সচকিত ভাবে রামশরণ বললেন, "চুপ্-চুপ্···আস্তে। ইন্স্পেক্টার শুনতে পাবে।"

একটা চোখ অর্দ্ধমুদ্রিত ক'রে আ-চিন্ বললে, "তোমার ইন্স্পেক্টার আজ সারা-রাতের মধ্যে আর জাগছে না বাপু; ওর খাবার জলে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছে, আজ সারা রাত ও ওইভাবেই ঘুমোবে। তোমায় যাতে সন্দেহ করতে না পারে সে উপায় আমি ক'রে যাচ্ছি, চিন্তা নেই।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে আ-চিন্ যখন সেই বাড়ী থেকে বেরুলো তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে।

সারারাত্রি একভাবেই কেটে গেল।

সকালের দিকে সুজন মিত্রের যখন ঘুম ভাঙলো, নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে করলেন তিনি। সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা, হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হয়। দশমাইল পথ পার্ব্বত্য-পথে ডুলি ক'রে আসা তাঁর কাছে আজ নতুন নয়, এই রামশরণ সিংয়ের নিমন্ত্রণেই

তিনি আরও দু-চার বার হাতীখালিতে এসেছেন-গেছেন, কিন্তু কোনোবারই তাঁর এরকম হয়নি।

বহু কষ্টে তিনি বসলেন, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে খুলতে পারলেন না, টানাটানি ক'রে বোঝা গেল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

এক মুহূর্ত্তে তাঁর সমস্ত জড়তা কেটে গেল, অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি—"রামশরণবাবু? দেওদার? সাংলো?"

কোথায়-বা কে! অত হাঁক-ডাকেও কারও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলনা। বাংলোতে কেউ নেই নাকি?

মনে পড়ে—পাশের ঘরে কৃষ্ণা আছে।

সুজন চীৎকার ক'রে ডাকেন—"কৃষ্ণা?"

কিন্তু তারও সাড়া পাওয়া গেলনা।

বিপদের আশঙ্কায় সুজন অভিভূত হয়ে পড়েন, কৃষ্ণার সাড়া না পেয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজায় সজোরে পদাঘাত করেন, দরজা ঝন্‌ঝন্ ক'রে ওঠে, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণা? তবে কি…

আবার পদাঘাত—উপর্য্যুপরি পদাঘাতে দরজা কাঁপতে থাকে। হাঁপিয়ে যান্ সুজন…খানিকটা বিশ্রাম…একটু সাম্‌লে নিয়ে আবার পদাঘাত—মড়-মড়-মড়…

ক্রমাগত ধাক্কার ফলে দরজার কিছু অংশ খসে যেতে, দেখা গেল, কৃষ্ণার ঘর শূন্য—ঘরের বিছানা, জিনিসপত্র সব ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত···দেখে বোঝা সহজ যে, ঘরের মধ্যে বেশ ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

বিমূঢ়ের মত সুজন দাঁড়িয়ে থাকেন, ভাবেন, কৃষ্ণার উপর আক্রমণ চলেছে, আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে, হয়তো চীৎকারও করেছে, কিন্তু সুজন এমন ঘুম ঘুমিয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙেনি? ছি-ছি, কি লজ্জা!

বাড়ীতে তো আরও লোক ছিল—রামশরণ সিং কোথায় গেলেন? তাঁর কি হলো? ··

রামশরণ সিংয়ের দরজা বাইরে থেকে শিকল বন্ধ। দরজা খুলে সুজন দেখতে পেলেন, মুখ-হাত-পা বাঁধা নিরুপায় রামশরণ চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

তাড়াতাড়ি সুজন তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

রামশরণ বিছানায় উঠে বসলেন···অবসন্ন। তাঁর উপর দিয়েও যে ভীষণ উৎপীড়ন-নিপীড়ন চলেছে তা দেখেই বোঝা যায়।

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি, রামশরণবাবু?

কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছি নে, আপনাকে এরকম অবস্থায় দেখছি, বাড়ীর আর-সব লোকজন কোথায় ?”

রামশরণ সিং ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, “কিছুই জানি নে আমি। একবার যেন মনে হলো, কে আমায় চেপে ধরেছে, তারপর সব অন্ধকার ! ঘুমিয়ে পড়েছিলুম খুব। কেউ নেই ? গেল কোথায় সব ?”

সুজন স্তব্ধ হয়ে থাকেন—যে উত্তর দেবে, উল্টে সে-ই তাঁকে প্রশ্ন করছে ? ব্যাপার মন্দ নয় ! কিন্তু গৌহাটী ফিরে গিয়ে প্রণবেশকে কি বলবেন তিনি ?

এগারো

ঘটনার অপরাংশে ওদিকে কৃষ্ণার জ্ঞান ফিরে আসে।

প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনা সে কোথায় ! চোখ মেলে সে এদিক-ওদিক তাকায়, বিস্মিত ভাবে উঠে ব'সে, সমস্ত কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

আস্তে-আস্তে মনে পড়ে···কাল সে গৌহাটী থেকে ল্যাংটিং এসেছিল, সেখানে ষ্টেশনে নেমে, ডুলিতে চেপে দশ মাইল দূরে হাতীখালিতে গিয়েছিল, তারপর সেখানে রামশরণ সিংয়ের অভ্যর্থনা আদর-আপ্যায়ন···অবশেষে তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাবধানে থাকার উপদেশ···

সেই রামশরণ সিং আর তার চিরশত্রু দস্যু আ-চিন্...

প্রথম থেকেই কৃষ্ণা রামশরণ সিংকে বিশ্বাস করতে পারেনি। লোকটার মুখ-চোখ দেখে মনে হয়েছিল, ধূর্ত্তের শিরোমণি সে।

কিন্তু কোথায় এসেছে সে? হাতীখালি থেকে কতদূরে? অথবা হাতীখালিতে সেই বাড়ীরই একটা ঘরে তাকে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে? কৃষ্ণা একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

এটা যেন ঠিক ঘর নয়; মনে হয়, পাহাড়ের একটা প্রায়ান্ধকার গুহা। কোনোদিকে জানলা নেই, উপরদিকে অনেক উঁচুতে খানিকটা জায়গা তারের জাল দেওয়া, সেখান থেকে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই এর অন্ধকার খানিকটা পাত্‌লা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা দেখলে—ঘরের মেঝেয় কতকগুলো খড়ের গাদায় কম্বল প'ড়ে আছে একখানা, তার উপরেই সে শুয়েছিল।

চারদিককার দেয়াল শক্ত পাথর কেটে তৈরী। মেঝেটাও তাই। একদিকে একটি মাত্র ছোট্ট দরজা, সে দরজাও বাইরে

থেকে বন্ধ। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসী, তার মুখে একটা মাটির গ্লাস। কলসীর কাছে মাটিরই একটা পাত্রে কি যেন ঢাকা দেওয়া আছে।

তৃষ্ণায় বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ! হয়তো ঐ কলসীটাতে জল আছে। দস্যুদের বুদ্ধি আছে। রামশরণ সিং, বা আ-চিন্, যেই তাকে বন্দী করুক···এত যন্ত্রণা দেওয়ার পরে বন্দীর যে পিপাসা লাগবে, এটা তাদের অজানা নেই···সাবাস্! এত দুঃখেও কৃষ্ণার হাসি আসে।

কোনো-রকমে এতক্ষণে সে উঠে বসলো।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা···মনে হয়, দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে। কোনোরকমে হামা-টানার মতন ক'রে সে ঘরের কোণে কলসীর কাছে পৌঁছলো,···কম্পিত-হাতে কলসীর মুখের গ্লাস নিয়ে এক নিশ্বাসে দু-গ্লাস জল পান ক'রে, তারপর মাথায়-মুখে জল দিলে। ভরসা ক'রে সে বেশী জল নষ্ট করতে পারে না···আর যদি না পায়?

এতক্ষণে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হলো, পূর্ব্বাপর ভাববার অবকাশ পেলে।

মনে পড়ে অতীতের কথা···বন্দিনী সে আরও বহুবার হয়েছে; নিজের অধ্যবসায়ে প্রতিবারে মুক্তিও পেয়েছে, কিন্তু এবারে কোথায় তাকে আনা হয়েছে জানবার উপায় কি? উপায়···উপায়···চিন্তার শেষ নেই···

মাটির থালার উপর ঢাক্‌নাটার দিকে এবার তার চোখ পড়ে। ঢাকাটা খুলে দ্যাখে—খান তিন-চার শক্ত মোটা রুটি···একপাশে খানিকটা গুড়···

হাসি পায় কৃষ্ণার, রুটি-গুড়ের দিকে তাকিয়েই তার পেট ভ'রে গেছে মনে হয়—অখাদ্য! খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা দিয়ে রেখে সে নিজের তৃণশয্যায় ফিরে এসে ভাবতে বসে। যেজন্যে তার আসামে আসা, তার কিছুই হলো না, লাভে থেকে সে নিজেই অপরিচিত লোকের হাতে বন্দিনী হলো! শুধু রতনের মুখে যতটুকু জানতে পেরেছে···অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সেইটুকুই মাত্র সম্বল তার। হাতীখালির বাংলোয় হয়তো অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারতো, কিন্তু সে-সুযোগ সে পেলেনা। মনে হয়, সুজন নিশ্চয় গৌহাটী ফিরে গিয়েছেন, তাঁর মুখে কৃষ্ণা-হরণের কথা শুনে বেচারা মামা··

প্রণবেশের সেই অবস্থা কল্পনা ক'রে কৃষ্ণা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

এখন চাই মুক্তি। কিন্তু মুক্তিলাভের পথ কই?

অনেক ওপরে ওই জাল-আঁটা ভেন্টিলেটার, কিন্তু অত উঁচুতে ওঠবার কোনো উপায়ই নেই !

তবু কৃষ্ণা সাড়া নিতে চায়···বদ্ধ-দরজায় আঘাত করে··· "বাইরে কেউ আছো কি ?" লোহার কপাট শুধু ঝন্-ঝন্ ক'রে ওঠে। কৃষ্ণা আবার সজোরে ধাক্কা দেয়···

কে যেন কর্কশ-কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, "এই, চুপ্ ক'রে থাকো।"

তাহ'লে মানুষ আছে।

কৃষ্ণা নিজের মনেই খানিকটা হেসে নেয়···নিজের মনেই ধারণা করে···এতক্ষণ প্রণবেশ ও সুজন পুলিস-প্রহরী নিয়ে হাতীখালিতে এসে পৌঁচেছেন···হাতীখালির বাংলো তাঁরা আতি-পাতি ক'রে খুঁজচেন···তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছেন, কৃষ্ণাকে আটক ক'রে রাখা হয়েছে। ভৃত্যদের পাবেন, কিন্তু রামশরণ সিংকে তাঁরা পাবেননা। কৃষ্ণা বেশ বুঝেছে, ভবতোষ চৌধুরী ও রুমার ব্যাপারে প্রধান আসামী ঐ রামশরণ। আ-চিন্‌কে কৃষ্ণা সেখানে দেখলেও সে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই রামশরণের দলের একজন। রামশরণ সিং সকল সন্দেহের অতীত হয়ে দূর হাতীখালিতে ব'সে থাকে, তার প্রধান পার্শ্বচর আ-চিন্ সব কাজ চালায়—কানপুরে ডাকাতির মূলেও আছে ঐ রামশরণ সিং ! কৃষ্ণার মনে প্রথম থেকেই যা সন্দেহ জেগেছে তা মিথ্যা নয়।

ঘরের ভিতরটা অল্পে-অল্পে অন্ধকার হয়ে আসে। কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বাইরের জগতে সন্ধ্যা নেমেছে।
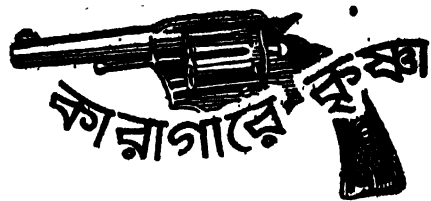
জ্ঞান ফেরবার পর থেকে জন-প্রাণীর মুখ দেখতে পায়নি সে। যারা তাকে বন্দী করেছে, তারাও নিশ্চিন্ত আছে যে, জল আর খাবার যখন দেওয়া আছে, তখন জ্ঞান ফিরলে কৃষ্ণা নিজেই খাবার নিয়ে খাবে।

দারুণ ক্রোধে কৃষ্ণা নিজের হাত কামড়ায়···

সুচতুর রামশরণ সিং সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, তার সহৃদয়তায় সুজন মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু সে কেন মুগ্ধ হলো— যখন তাকে দেখেই তার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল ?

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায় !

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সেই মসী-মলিন অন্ধকার ঘরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন কৃষ্ণা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না !

বারো

অকস্মাৎ কৃষ্ণার ঘুম ভেঙে যায়।

অন্ধকার ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় সে দেখতে পায় তার শয্যার পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

—"কে ?"

শঙ্কিতভাবে কৃষ্ণা ধড়মড় ক'রে উঠে বসে, দু'হাতে চোখ মুছে সে ভালো ক'রে তাকায়—আ-চিন্‌কে চিনতে তার দেরী হয়না।

—"তোমায় আমি চিনি···তুমি আ-চিন্।"

আ-চিনের একটা-চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করে···শিকার আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে হিংস্র বাঘ যেমন তার ক্ষরিত রক্ত লেহন করবার জন্যে মুহুর্মুহুঃ জিহ্বা সংকোচন-প্রসারণ করে, তেমনি নিজের সরস জিভটা বারবার অধরোষ্ঠে বুলোতে-বুলোতে আ-চিন্ বললে, "হ্যাঁ, আমি আ-চিন্‌ই বটে। আজও দেখচি তুমি আমায় ভুলে যাওনি সুন্দরী! ঘটনাক্রমে কয়েকদিন আগে ট্রেনে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল! আমি তোমায় দেখা মাত্র চিনেছিলাম, দেখচি, তুমিও আমায় ভোলোনি—তাই না ?"

ঘৃণায় কৃষ্ণার মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, বিকৃত-কণ্ঠে বলে, "হ্যাঁ, তোমায় আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। যেখানে দেখবো তোমায় চিনতে পারবো। বহুকাল তোমায় দেখিনি, ভেবেছিলুম আমার জীবনে আর কোনোদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা। হঠাৎ আবার যে তোমায় এই অবস্থায় দেখতে পাবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

কোমল-কণ্ঠে আ-চিন্ বললে, "সেটা নেহাৎ ভগবানের দয়া, কৃষ্ণাদেবী! আমি এ-পর্য্যন্ত তোমার খোঁজে বহুৎ জায়গায়

ঘুরে বেড়িয়েছি—শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় আছো, তাই কলকাতা পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম, সেখানে শুনলাম, তুমি আসাম রওনা হয়েছো। ভগবানের দয়ায় তুমি যে-ট্রেনে আসছিলে, আমিও ঠিক সেই ট্রেনেই…"

—"তোমার মুখে ভগবান! হ্যাঁ, ভগবানের দয়াই বটে।"

ঘৃণায় কৃষ্ণা আর কথা বলতে পারেনা—তার মুখ দেখে আ-চিন্ বুঝতে পারে, বলে, "আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা করো—কিন্তু ভগবানের দিব্য কৃষ্ণাদেবী, আমি ঘৃণার কাজ এমন কিছু করিনি, যাতে…"

অকস্মাৎ কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—"থাক্, থাক্, আর ভগবান্‌কে ডেকোনা এর মধ্যে। ও-মুখে ও-কথা মানায়না। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে যত কথাই তুমি বলোনা কেন, তোমায় আমি চিনি। তুমি—তুমি আমার পিতা-মাতার হত্যাকারী, তুমি "

বলতে-বলতে অকস্মাৎ তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলে নেয় সে, তারপরে বলে, "শুধু আমি নই, পুলিসও জানে তোমাকে, আজও তোমার নামে ওয়ারেণ্ট

ঝুলছে, আর তোমায় ধ'রে দেওয়া বা তোমার সন্ধান ক'রে দেওয়ার জন্তে পুরস্কার ঘোষণা করা আছে, সে-কথাও তুমি জানো। হত্যাকারী-দলের সকলেই প্রায় ধরা পড়েছে, একমাত্র তুমিই গা ঢাকা দিতে পেরেচো, পুলিস তোমায় খুঁজে পায়নি। সেদিন তোমায় দেখেই আমি বুঝেছিলুম তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে ব'সে নেই, বাংলায় না হোক্, বাংলার বাইরে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেছে। তুমি যে রামশরণ সিংয়ের সহকারী রূপে…"

—"রামশরণ সিংয়ের সহকারী ?"

আ-চিন্ অট্টহাসি হাসে…দরজা-জানলা-বিহীন কারাগারের বদ্ধ-ঘরটা তার হাসির ধমকে যেন কাঁপে…

কৃষ্ণা দু'হাত কানে চাপা দেয়, রুক্ষকণ্ঠে বলে, "তোমায় মিনতি করছি আ-চিন্, এখান থেকে তুমি বিদায় নাও—আমায় একটু নির্জ্জনে থাকতে দাও।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে আ-চিন্ বললে, "আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসিনি কৃষ্ণাদেবী, তোমায় শুধু একবার দেখতে এসেছি। দেখছি, এখানে ওরা যে খাবার দিয়ে গেছে তা তুমি খাওনি, তেমনি ঢাকা প'ড়ে আছে।"

বলেই এগিয়ে গিয়ে ঢাকা খুলে খাবার দেখে আপন মনে সে গর্জ্জন করে—"এ কি! এ খাবার কি কেউ খেতে পারে? এই মোটা-মোটা পোড়া শক্ত রুটি আর একটু গুড়! তারপর হাঁক দেয়—"পারিসানা…লতিফ ?"
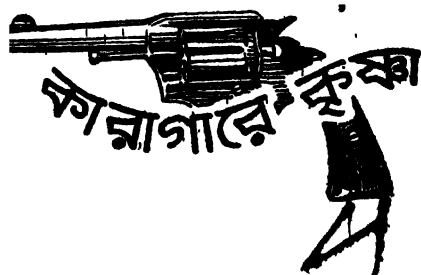
—"জী, হুজুর !"

সসম্ভ্রমে দ্বারের প্রহরী সামনে আসতেই আ-চিন্ আবার গর্জ্জন করে, "এ খাবার এখানে কে দিয়েছে ?"

পারিসানা সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়, "আউলেন দিয়ে গেছে, হুজুর !"

আ-চিন্ আদেশ করে—"নিয়ে যাও। শীগগির চা আর টোষ্ট নিয়ে এসো।"

কিছুক্ষণ পরে চা-টোষ্ট এসে পড়ে—

আ-চিন্ বলে, "খেয়ে নাও কৃষ্ণাদেবী, কাল থেকে কিছু খাওনি, দেরী কোরো না।"

কৃষ্ণা বলে, "ধন্যবাদ ! দরকার নেই এ-সব, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো।"

আ-চিন্ বললে, "না খেয়ে কতদিন থাকবে ? একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন, হয়তো চিরদিনই তোমায় এখানে থাকতে হবে, না খেলে কি চলে, সুন্দরী !"

কৃষ্ণা মুখ তোলে, বলে, "তাই নাকি ? কিন্তু আমাকে

কোথায় এনেচো আগে সেই কথাটা দয়া ক'রে জানাও। আচ্ছা, আমায় বন্দী করবার কি প্রয়োজন ছিল তোমার? তোমার স্বার্থে কোনো আঘাত দিয়েছি আমি?"

আ-চিন্ বীভৎস-হাসি হাসে; বলে, "আমার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই তো তোমায় এনেছি। মনে করো সেদিনের কথা, তখন তোমার বয়স চোদ্দ কি পনেরো। সেদিন তোমায় আমি ভালোবাসা জানানোর অপরাধে তোমার বাবা পা থেকে জুতো খুলে আমায় মেরেছিলেন···আমায় চোর অপবাদ দিয়ে পুলিসে দিয়েছিলেন···তাঁর বন্ধু পুলিস-অফিসার আমার একটি কথাও কানে নেয়নি···উঃ, সে কি নির্য্যাতন সেদিন সইতে হয়েছিল, ভাবলে···যাক্, আজ আমি তোমায় কি ব'লে সম্ভাষণ করবো—প্রিয়তমে? না, ডার্লিং? তুমি কোন্‌টা পছন্দ করো?···"

আ-চিনের মুখ থেকে তার সরস জিভটা বেরিয়ে ঠোঁটের ওপর-নীচে ভেজাতে থাকে···

—"আ-চিন্?"

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—"তুমি কি আমায় হাতের মধ্যে পেয়ে এমনি ক'রে অপমান করতে চাও?"

আ-চিন্ মাথা নাড়ে—"না—না—না। ভুল কোরো না কৃষ্ণাদেবী, আমি আজও তোমায় ভালোবাসি, আর ভালোবাসার পাত্রীকে কেউ অপমান বা নির্য্যাতন করতে পারেনা। আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেই আমি তোমায় স্বাধীনতা দেবো, তোমায়

রাণী ক'রে রাখবো—মোট কথা, আমি তোমায় চাই। যাক্, এখন খেয়ে নাও, আমার কথাগুলো আজ ভালো ক'রে ভেবে দেখ···কাল, পরশু, যেদিন হোক্ আমি তোমার কাছ থেকে এর একটা উত্তর চাই।"

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে সে আবার ফিরলো—"হ্যাঁ, কোথায় তোমাকে আনা হয়েছে জানতে চাচ্ছিলে, না? এ-জায়গার নাম—'মায়'। পাহাড়ের মাঝখানে ব'লে এখানে জনমানবের যাতায়াত নেই—কেবল আমরাই আসি-যাই, থাকি। আচ্ছা, আজ বিদায়!"

আত্মপ্রসাদের বিজয়-হাসি হেসে সে বিদায় নিলে।

তেরো

একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে গেল, আ-চিনের দেখা নেই। খাবার দিতে লোক আসে দু'বার। বন্দিনী কৃষ্ণার বরাত ভালো—সকালে ভাত-তরকারি মাছ···সন্ধ্যার দিকে গরম-গরম খানকতক লুচি, তার সঙ্গে মাংস, দুধ, মিষ্টান্ন···

মনে-মনে কৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে···যে লোক খাবার দিতে আসে, তাকে জিজ্ঞাসা করে—"আ-চিন্ কোথায় ?"

কিন্তু জবাব দেবে কে ? লোকটা শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে, তারপর কিছু বুঝেই বোধহয় ফিক্ ক'রে হেসে, হাতের তর্জ্জনী একবার মুখে আর একবার কানে ঠেকিয়ে ইসারায় জানায়—সে বোবা···সে কালা !

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা কৃষ্ণার ব্যথা-ভরা মুখখানাকে মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দর ক'রে তোলে, মনে-মনে সে স্বীকার করে—হ্যাঁ, আ-চিনের লোক-নির্ব্বাচন শক্তি আছে। সঙ্গে-সঙ্গে গৌহাটীর সুমিয়ার কথা মনে হয়, সেও যেমন বোবা-কালার ভাণ করেছিল, এও বোধহয় তাই।

উপায় নেই—কোনো উপায় নাই তার। দরজায় দু-জন সশস্ত্র প্রহরী···লোকটা যখন খাবার দিতে আসে, সে-সময়েও পালাবার কোনো উপায় নেই।

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায়,—একা-একা বদ্ধ ঘরের মধ্যে চঞ্চলা সিংহিনীর মত ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি-দেবীর আরাধনা করে—তুমি এসো মা, কণ্ঠে—বাণী বাগ্‌বাদিনী ! বাঙালী-মেয়ের মৌন মুখে মুক্তির ভাষা দাও মা !

তিনদিন পরে—

দরজা খুলে প্রবেশ করে আ-চিন্, বলে, "খবর কি কৃষ্ণাদেবী !

খাওয়া-দাওয়া···তোমার আদর-যত্নের নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি হয়নি ?”

—“আদর-যত্ন ?”

একমুহূর্ত্ত থেমে সে উত্তর দেয়—“হ্যাঁ, বন্দিনীর পক্ষে যতটা আদর-যত্ন পাওয়া সম্ভব তা আমি পাচ্ছি, সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এ-সবের মানে কি ? এই আদর-আপ্যায়ন···এই অস্বাস্থ্যকর ঘর···এখানে বন্দী ক'রে রেখে, বন্দিনীর কাছে মিষ্ট-মধুর প্রেমালাপের প্রলাপ ব'কে যাওয়া···তুমি চাও কি ? কি তোমার বাসনা ? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, দয়া ক'রে আমায় বাইরে যাবার অনুমতি দাও যদি···”

আ-চিন্ বললে, “আমি তো বলেছি প্রিয়তমে, আমার কথা শুনলেই আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দেবো। আমার পাশে-পাশে তোমার যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার অধিকার থাকবে—তুমি শুধু আমায় কথা দাও, আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে রাজী আছো—ব্যস্। এই মুহূর্ত্তে তোমায় মুক্ত ক'রে দেবো।”

—“শয়তান !”

গর্জ্জন ক'রে উঠেই কৃষ্ণা ঝিমিয়ে পড়ে। আ-চিনের স্পর্দ্ধা! কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা···আ-চিন্ বিদেশ থেকে যখন দেশে ফিরে আসে, তার পিতাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আ-চিন্ সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছিল, আশ্রয়দাতার কন্যা কৃষ্ণার হাত চেপে ধ'রে। সেদিন সহসা কৃষ্ণার হাত চেপে ধরার পর উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে পিতা তার আ-চিন্‌কে পুলিসের হাতে দেবার সময় সেই যে আ-চিন্ শাসিয়ে গেছলো, তারপর থেকে···

আত্মগোপন করে কৃষ্ণা। সে জানে—এখানে তার দম্ভের, তার অহঙ্কারের কোনো মূল্য নেই, বরং তার ফলে তাকে নির্য্যাতনই সইতে হবে। তাহ'লে? তাহ'লে? কৃষ্ণার মনে পড়ে যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার কথা। হ্যাঁ, নিজে মুক্তি লাভ করতে এবং যার জন্যে সে এসেছে সেই রুমাদেবী ও ভবতোষ চৌধুরীকে মুক্ত করতে তাকে চাতুর্য্যের আশ্রয় নিতে হবে। তাকে 'বিমলা'র ভূমিকা অভিনয় করতে হবে।

এতক্ষণে নিজের কর্ত্তব্য সে ঠিক ক'রে নিয়েছে—

শান্তকণ্ঠে সে বললে, "আচ্ছা আ-চিন্, আমার কাছে তুমি চাও কি?"

আ-চিনের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, "তুমি জানো আমি তোমার কাছে কি চাই। আমি চাই তোমায় সহধর্ম্মিণী রূপে পেতে।" সহসা নারী-কণ্ঠের উচ্চ-হাসি মিহিসুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—"সহধর্ম্মিণী? তোমার দস্যু-ধর্ম্মের অনুসঙ্গিনী!
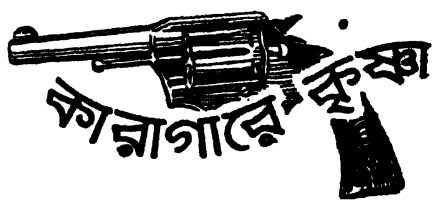
এত দুঃখ দিয়েও তুমি যে আমায় হাসাতে পারলে এখন, এর জন্যে তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় দস্যু।”

—“দস্যু? কিন্তু বুদ্ধিমতী, ভেবে দেখ, তোমায় আমি কত ভালোবাসি! দস্যু হয়েছিলাম বলেই তুমি আজ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছো···আমি যে আজ দস্যু, সে-ও তো তোমারই জন্যে।”

—“আমার জন্যে?”

—“হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার জন্যে। আজ যদি আ-চিন্ দস্যু—সাধু আ-চিন্ ব'লে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করতো, তাহ'লে তোমার স্থান কোথায় হতো, বিদূষী তরুণী? তোমায় চিন্‌তো কে? তোমায় যে—পর্দ্দানসীন লজ্জাবতী সরলা-অবলা বাঙালী-মেয়ে হয়ে, রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে হতো, গোয়েন্দা-রাণী!”

—“বাঃ! সুন্দর! বাংলা-ভাষা তোমার বেশ আয়ত্তে এসেছে দেখচি। এত বাংলা তত্ত্বকথা তুমি শিখলে কোথায়?”

—“কেন, তোমার পিতার আশ্রয়ে থেকে? একটা বিরাট দলের সর্দ্দারী করতে হ'লে শুধু বহুরূপী হ'লে হয়না, বহুভাষা-

ভাষীও হতে হয়। এর জন্যে—শুধু তোমায় পাবার জন্যে দস্তুরমত বঙ্গবাণীর আরাধনা করতে হয়েছে আমায়।”

আ-চিনের মুখে এইসব কথা শুনে কৃষ্ণা হাসে…

কৃষ্ণার মৃদু-হাসিতে আ-চিনের নিরাশ মনে আশার সঞ্চার হয়, সে ঠোঁটে জিভ বুলোতে-বুলোতে বলে,—“তাছাড়া, তখন আর আমি দস্যু আ-চিন্ থাকবো না। কৃষ্ণা দেবীর স্বামীত্ব লাভ ক’রে আমি দেবত্ব পেয়ে যাবো।”

কৃষ্ণা বলে, “ওসব সাময়িক উত্তেজনার কথা। ওই ধরনের কথা শুনে-শুনে কান আমার বধির হয়ে গেছে…ওসব কথা আর কানে আসেনা…এলেও শুনতে ভালো লাগে না। ওইরকম কথা ব’লে-ব’লে, আর-একজন আমায় মজিয়ে গেছে—ঈস্! কি ভালোই যে তাকে বাসতুম আমি…কি ভালোই যে সে বেসেছিল আমায়…”

ভালোবাসা-বাসির কথা—কৃষ্ণার মুখে? আ-চিনের সরস জিভটা মুহুর্মুহুঃ সঞ্চালিত হয়ে ভিজিয়ে তোলে ওর শুক্‌নো ঠোঁট দুটোকে…এতক্ষণে কৃষ্ণা লয়ে এসেছে…“কি-রকম, কি-রকম সে ভালোবাসার ইতিহাস—বলতে বাধা আছে কি? অৰ্দ্ধেক তো বলেই ফেল্‌লে—বাকিটা কৃষ্ণাদেবী…শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। নির্জ্জন বন্দীশালা…দীর্ঘ অবসর…এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর অলক্ষ্যে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী…সে ভাগ্যবানটি কে, কৃষ্ণাদেবী?”

বা রে আ-চিন্! তোমার দস্যু-হৃদয়ের অন্তস্তলেও অতনুর আনাগোনা আছে তাহ'লে!

কৃষ্ণা বললে, "না, আর বলতে বাধা কি? তাছাড়া শুনে তোমার লাভও আছে যথেষ্ট। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যখন তোমার হাত থেকে আর নিস্তার নেই, তখন বলেই যাই, কিন্তু আমার কাহিনীও ফুরুবে, আর আমার হাতের এই আংটি দেখেচো? রিয়েল্ ডায়মণ্ড! খাঁটি হীরে! একবার জিভে ঠেকালেই ব্যস্! তারপর মাথার ওপর ওই অনন্ত মুক্ত আকাশ …মহাশূন্য…বায়ুস্তরে মিশিয়ে যাবে কৃষ্ণার অন্তরাত্মা!" বলেই কৃষ্ণা ডান-হাতের তর্জ্জনী আকাশের দিকে দেখাবার ভঙ্গীতে উপরের ভেন্টিলেটারের দিকে তুলে ধরতেই, মোহমুগ্ধ আ-চিন্ যেমন সেইদিকে চোখ ফিরিয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে আ-চিনের আল্‌গা-হাতে ধরা রিভলভারটা ফস্ ক'রে কৃষ্ণা নিজের হাতে নিয়ে নিলে! আ-চিন্ স্তম্ভিত! সে কিছু বলবার আগেই সহাস্যে কৃষ্ণা বললে, "হাত পাতো…লুফে নাও।"

কৃষ্ণার হাতের রিভলভার অল্প শূন্যে উঠেই আবার আ-চিনের

হাতে ফিরে এলো। আ-চিন্ বুঝলে, আর যাই হোক্, কৃষ্ণার উদ্দেশ্য খারাপ নয়···পাখী পোষ মেনেছে!

কৃষ্ণা বলতে সুরু করলে:

"আমি তখন কলেজে থার্ড-ইয়ারে। যুবতী মেয়েদের রূপ থাকলে যা হয়, অনেকেই ফাঁদ পাতলে···শেষে ধরা পড়লুম যার কাছে, সে হুবহু তোমার মত দেখতে···একটি বার্ম্মিজ-ছেলে। তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে, তাই এখনো বেঁচে আছি—নইলে মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য···এই আংটি দেখেচো? আর বাঁচিয়ে রেখেচি তোমায়, নইলে ঐ রিভলভার আর তোমার হাতে ফিরে যেতো না। যাক্, যে-কথা বল্‌ছিলুম, হ্যাঁ, তার প্রেমে পড়বার পর বুঝলুম সে একজন অ্যানার্কিষ্ট। তারপর আর কি? দেশের জন্যেই হোক্ আর যে-জন্যেই হোক্, রাজার বিরুদ্ধে গেলে চিরকাল যা হয়ে আসচে—বিচারে তার দণ্ড হলো—আজ সে দ্বীপান্তরে। আজ যদি তোমার সঙ্গে প্রেম করি আ-চিন্, যদি কোনোদিন সুদিন আসে, সে যদি ফিরে আসে—তখন? তখন কি সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বাধিয়ে দেবো?"

সব কথা না বুঝলেও, আ-চিনের বুদ্ধিতে এটা এসে গেল যে, যদিও সে হতভাগাটা কোনোদিন ফিরে আসে—তখন কৃষ্ণাকে পাওয়ার সাধ আ-চিনের মিটে যাবে। সে শপথের প্রতিশ্রুতি দিলে; বললে, "সে আর ফিরেচে, আর যদিই ফেরে, তখন···এই

রিভলভারটা তোমায় দিয়ে দিলাম···আমার ভালোবাসার জামিন।”
···বলেই সে কৃষ্ণার একখানা হাত চেপে ধ’রে, আর-এক হাতে রিভলভারটা গুঁজে দিয়ে বললে, “এবার তুমি মুক্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পাশে-পাশে থাকতে হবে। কেমন, রাজি?”

কৃষ্ণা উত্তর দিলে, “রাজী, কিন্তু এক সর্ত্তে। আজ থেকে তিন মাস, দশ দিন পরে আমার পিতার কালাশৌচ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করবে না—আমার সংস্পর্শে আসবে না। এই সর্ত্তে রাজী হলেই তোমার ভালোবাসার মূল্য বুঝতে আমার দেরী হবেনা। যখন বাঁচতেই হবে, তখন এরকম ভাবে বন্দিনী অবস্থায় চিরকাল কাটাবার চেয়ে আমি তোমার কাছে বাইরে থেকেই বাঁচতে চাই। তোমার ভগবানের দিব্য।”

আ-চিন্ হেসে ওঠে—“বেশ, তোমার সর্ত্তেই রাজী আমি। মাত্র তিন-চারটে মাস তো? কী আর করা যাবে! কিন্তু আমার কোনো ভগবান নেই কৃষ্ণা—কাজেই তার নামে দিব্য করা একেবারে মিথ্যে বলেই মনে হয়।”

খুশী-মুখে কৃষ্ণা বললে, "আমারও। কারণ আমি জানি, সবার উপরে মানুষই সত্য। শুধু শপথটা দৃঢ় করবার জন্যেই আমি ভগবানের নাম করেচি, নইলে…"

দরজার কাছ থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"এদিকে একবার দরকার আছে হুজুর!"

—"এসো কৃষ্ণা, আমার সঙ্গে বাইরে এসো, আর একটা কথা মনে রেখো, এখানে যা-কিছু দেখবে, শুধু দেখেই যাবে, কোনো কথা বলতে পারবে না।"

আ-চিনের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণা বাইরে বেরিয়ে আসে।

অন্ধকার পার্ব্বত্য-গুহা—এঁকে-বেঁকে ঘুরে গেছে। খানিক দূর গিয়ে তবে পাওয়া যায় মুক্ত দিনের আলো—"আ-আ-আঃ!"

বাইরের উন্মুক্ত আলোয় এসে কৃষ্ণা নূতন জীবন ফিরে পায়, প্রাণভ'রে সে নিশ্বাস গ্রহণ করে, তারপর তাকায় আশে-পাশে—

আ-চিনের দলভুক্ত কয়েকজন লোক যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল, বিস্মিত-চোখে তারা কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে…

দুর্ব্বোধ্য-ভাষায় আ-চিন্ তাদের কি বলে, হয়তো কৃষ্ণার সম্বন্ধেই কিছু জানায় তাদের,—সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দে লোকগুলি কৃষ্ণাকে অভিবাদন করে, তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে যায় পাহাড়ের বাঁকে। ওদের মধ্যে একটি লোককে দেখে কৃষ্ণা চিনতে পারে। এ সেই লোক—যাকে সে ক'দিন আগে

মিয়াংয়ে দেখে প্রচুর বিস্মিত হয়ে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছিল।

যেমন করেই হোক্, কার্য্যোদ্ধার সে করবেই···এই আ-চিন্‌কে হস্তগত করেই সব-কিছু করবে। ভীষণ-প্রকৃতির এই লোকটিকে সে দারুণ ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণা যেন তার কোনো কাজে বা কথাবার্ত্তায় না ফুটে ওঠে, সেদিকে কৃষ্ণা সতর্ক হয়।

চোদ্দ

অতি সতর্ক আ-চিন্। কৃষ্ণা বেশ বুঝতে পারে, আ-চিন্ তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনা। মুক্ত-আলোয় চলাফেরা করলেও কৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে তার নজরবন্দী হয়ে আছে।

মাঝে-মাঝে আ-চিন্ কোথায় যায়,—সে-সময় কৃষ্ণার ভার থাকে, আ-চিনের পরম বিশ্বাসী সতর্ক-প্রহরিণী সুমিয়ার ওপর।

সুমিয়াকে কৃষ্ণা চিনেছে। গৌহাটীতে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে বোবা-কালার অভিনয়ে সুদক্ষ সুমিয়াকে সে দেখেছিল।

গত-কাল টিটাগড় যাওয়ার সময় আ-চিন্ যখন কৃষ্ণাকে পাহারা দেবার জন্যে সুমিয়াকে এনেছে, তখনই সে সুমিয়াকে চিনেছে।

আ-চিন্ সুমিয়াকে আদেশ দিলে, "এই মেয়েটি তোমার জিম্মায় রইলো সুমিয়া—কোনোরকমে যেন এর কষ্ট না হয়, দেখবে। আমি দিনকয়েক পরেই ফিরবো—এই সময়টুকু খুব সতর্ক থাকবে, কোনোরকমে গাফিলি না হয়—বুঝলে?"

কুর্নিশের ভঙ্গিতে সুমিয়া সেলাম করে—সে বুঝেছে। সে বোবা নয়—কালাও নয়। অথচ রতনের কাছে তখন কৃষ্ণা শুনেছিল, তিন-চার মাস সে গৌহাটিতে তাদের বাড়ী থাকার সময় সম্পূর্ণ বোবা-কালার অভিনয় ক'রে এসেছে।

রতন বলেছিল, মেয়েটি লেখাপড়া জানে। সেদিন সে বিস্মিত হয়েছিল, সেই মুহূর্ত্তেই একে সন্দেহ করেছিল—নিশ্চয়ই এ গুপ্তচরের কাজ করতে এসেছে। তার ধারণা যে মিথ্যে নয়, তা আজ বুঝেছে।

তবু সে কতকটা খুশী হলো। যাই-হোক্, সুমিয়া মেয়ে, যে-কোনোরকমে তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করে—"তোমায় গৌহাটীতে দেখেছিলাম না সুমিয়া!...ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে? আচ্ছা, সেখানে তুমি বোবা-কালা সেজেছিলে কেন?"

সুমিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে...উত্তর দেয়না।
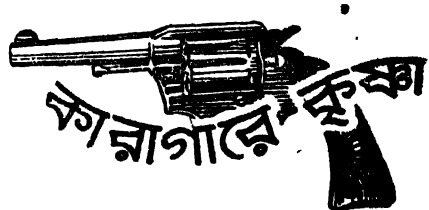
কৃষ্ণার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে; বলে, "তোমায় তখনই সন্দেহ করেছিলুম সুমিয়া, আ-চিন্ যে তোমায় সেখানে তার গুপ্তচর হিসেবে রেখেছিল, বুঝেছিলুম আমি।...নয় কি?"

সুমিয়া উত্তর দেয়, "ঠিক্ আ-চিন্‌ই যে রেখেছিল তা নয়, বরং আমিই তাঁর কাজ করতে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলুম।"

কৃষ্ণা বললে, "স্বেচ্ছায় হোক্ বা টাকা বেশী পাওয়ার জন্যেই হোক্, তুমি গিয়েছিলে। শুনলুম, ভবতোষ চৌধুরী তোমায় জায়গা দিতে চান্‌নি, কিন্তু রুমাদেবী তাঁর পিতার অমতে তোমায় স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন্‌নি যে, তাঁর সেই বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে তুমি এতখানি কৃতঘ্ন হবে। আ-চিন্ তোমাদের, অর্থাৎ, দলের লোকদের অনেক টাকাকড়ি দেয় জানি—"

বাধা দিয়ে সুমিয়া বললে, "টাকা-কড়ির কোনো কথা এখানে ওঠেনা কৃষ্ণাদেবী!"

কৃষ্ণা তার দৃপ্ত মুখখানার পানে তাকায়, বলে, "তবে দলবদ্ধ-ভাবে তোমরা এমনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো বুঝি? দলের সব লোকই তো আ-চিনের জন্যে প্রাণ দিতে পারে শুনেচি।"

সুমিয়া আবার হাসে; বলে, "সে-কথা বলতে পারেন। আমরা আ-চিনের নিমক খেয়েছি···নিমক-হারামী আমাদের জাত কোনোদিন করেনি···করবেও না কোনোদিন। মহামান্য আ-চিন্‌কে আপনি যতটা হেয়, ঘৃণ্য মনে করছেন, সত্যিই তিনি তা নন্‌। কতখানি দুঃখ, কতখানি কষ্ট পেয়ে তিনি আজ ঘৃণ্য দস্যুসর্দ্দারে পরিণত হয়েছেন তা যদি জানতেন, তাহ'লে তার সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে পারতেন না। তিনি যে কতখানি মহানুভব···কতখানি···"

কথাটা সে শেষ করেনা—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কৃষ্ণা তার মুখের দিকে তাকায়, সুমিয়ার চোখে স্পষ্ট জল দেখা যায়, তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে ফ্যালে।

না, সুমিয়া মেয়েটি মন্দ নয়। দিন-রাতই সে কৃষ্ণার পাশে-পাশে থাকে, কত গল্প করে দেশ-বিদেশের। তার তেইশ-চব্বিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস···কত দেশ-বিদেশের কাহিনী··· আ-চিনের সেই সময়কার উদারতার পরিচয়···

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে—"বাংলা দেশে কখনো গিয়েছিলে সুমিয়া?"

সুমিয়া উত্তর দিলে—"আমাদের সর্দ্দারের সঙ্গে এইতো মাস-পাঁচেক আগে কলকাতায় গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশী দিন থাকা হয়নি কৃষ্ণাদেবী, দিন-সাতেক মাত্র ছিলুম। সর্দ্দার আপনাদের বাড়ী দেখালেন···আপনি তখন প'ড়ে বাড়ী ফিরছিলেন।"

বিস্মিত হয়ে যায় কৃষ্ণা। আ-চিন্ সুমিয়াকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে···তাদের বাড়ীখানাও দেখিয়েছে একে! হবে, সে হয়তো সে-সময় কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছিল, দূর থেকে আ-চিন্ তাকেও দেখিয়েছে—আশ্চর্য্য কথা বটে!

কৃষ্ণা বললে, "হঠাৎ আমাদের বাড়ী, আর আমাকে দেখানোর কারণ তো কিছু বুঝতে পারলুম না, সুমিয়া! যাক্, সে নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্চি—আ-চিন্ মহৎ লোক, সব দিক্ দিয়ে সে শ্রেষ্ঠ, সে মহান্, কিন্তু ভবতোষ চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে রুমাদেবীকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়ার কারণ তো বুঝতে পারলুম না!"

সুমিয়ার চোখ দুটি জ্বলে, সে বলে, "বড় জ্বালায়, বড় দুঃখে সর্দ্দার ওঁদের সরিয়েছেন, কৃষ্ণাদেবী। আপনি যদি সব কথা শোনেন, তাহ'লে চৌধুরীকে আন্তরিক ঘৃণাই করবেন। অবশ্য, রুমাদেবীর অপরাধ নেই। তাঁকে সব কথা জানানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি সর্দ্দারকে পুলিসের হাতে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আর সেইজন্যেই আজ তাঁকেও

বন্দিনী হতে হয়েছে···অসম্ভব কষ্টে তাঁর দিন যাচ্ছে। তাঁর বাপের জন্যেই তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, এ কর্ম্মফল তাঁর নিজের—আ-চিনের নয়।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "সে-সব কথা কি আমি শুনতে পাইনা সুমিয়া?"

সুমিয়া উত্তর দিলে, "সর্দ্দার বললেই জানাবো কৃষ্ণাদেবী, তাঁর অনুমতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারবোনা। তিনি দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন, তাঁর মুখেই সব কথা শুনতে পাবেন।"

কৃষ্ণা এ-সম্বন্ধে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনা, সুমিয়াও এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলেনা।

দিনের পর দিন চলে যায়···

কৃষ্ণা মনে-মনে অস্থির হয়ে ওঠে। কোথায় সে আছে, সত্যি এ-জায়গার নাম কি সে কিছুই জানেনা—সুমিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে সে একই উত্তর দেয়—"সর্দার এলে সবই জানতে পারবেন।"

কেবল সুমিয়াই নয়, আরও পাঁচ-সাত জন লোক এখানে থাকে। কৃষ্ণা স্বচ্ছন্দভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, পাশে-পাশে থাকে সুমিয়া।

সেদিন সুমিয়া আসতে পারেনি, সঙ্গে এসেছিল, মিংলো—অল্প বয়সের একটি ছেলে, কৃষ্ণাকে সে বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে
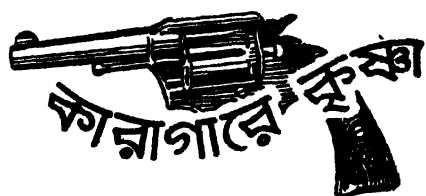
দেখতো ; কৃষ্ণার কোনো কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতো।

প্রায়ই সে কৃষ্ণার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু সুমিয়ার সতর্কতার দরুণ কোনো দিনই সে তার কাছে আসবার সুযোগ পায়নি। আজ কৃষ্ণার প্রহরী রূপে তার সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণা তার সঙ্গে গল্প জমায়···মিংলোর মুখ থেকে তার কাহিনী শোনে ঃ

মিংলোর দেশ—লখিমপুর থেকে দশ-পনেরো মাইল দূর একটা গ্রামে। তার পিতা, মহামান্য আ-চিনের দলে আসবার সময় মাতৃহারা মিংলোকেও নিয়ে আসে, সেই থেকে আজ তিন বছর সে এখানেই আছে। পিতার কথা বলতে-বলতে তরুণ মিংলোর চোখে জল আসে। তার পিতা পাঁচ মাস আগে পুলিসের গুলীতে মারা গেছে, আজ আপনার বলতে জগতে মিংলোর আর কেউ নেই।

মিংলোকে সহসা সাথী পাওয়াটা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলেই

মনে হয়। চতুরা সুমিয়ার কাছ থেকে এতদিনের মধ্যে এঁদের কোনো কথাই কৃষ্ণা জানতে পারেনি; মিংলোর কাছ থেকে এখন তবু কিছু-কিছু জানা যাচ্চে।

চলতে-চলতে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা মিংলো, গৌহাটী থেকে যে আর-একটি মেয়েকে মাস দুই-তিন আগে আ-চিন্ নিয়ে এসেছে, তাকেও এখানে রাখা হয়েচে তো? কৈ, তাকে তো একদিনও দেখিনি এখানে!"

কৃষ্ণার প্রশ্ন বেশ মিষ্টি লাগে মিংলোর···সে আরামের হাসি হাসে; বলে, "তাকে দেখবে কি ক'রে? সে তো এখানে ছিলনা; তাকে যেখানে রেখেছিল সেখানে পুলিস হানা দেবে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনেছে। এই তো সবে কাল রাত্রে এসেছে সে···তার জন্যেই তো সুমিয়া আজ তোমার সঙ্গে আসেনি।"

রুমাকে কাল রাত্রে এরা এনেছে এখানে···

কৃষ্ণার মুখখানা দৃপ্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, "আমি যে-ঘরে ছিলুম, তাকে বোধহয় সেই ঘরেই রেখেচে, তাই সুমিয়া আজ আসতে পারেনি···তাকে পাহারা দিচ্চে!"

মিংলো বললে, "তা আমি বলতে পারিনে। ওইরকম কোনো জায়গায় হয়তো তাকে রেখেছে; সুমিয়া তো জানে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।"

তখনকার মত কৃষ্ণা চুপ ক'রে যায়।

পনেরো
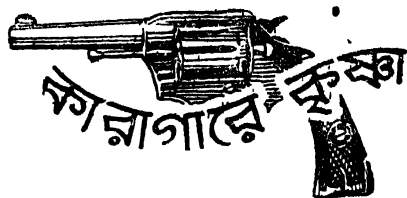
গভীর রাত্রি। আস্তে-আস্তে কৃষ্ণা উঠলো…

ওদিকে গভীর ঘুমে ডুবে আছে সুমিয়া। নাক ডাকছে ওর। ভয়াবহ নিঝুম অন্ধকার রাত। বন্দীশালার এই নিস্তব্ধ ভূতুড়ে-আবহের মধ্যে জীবন্ত প্রাণী একা কৃষ্ণার গা ছম্‌ছম্‌ করে… হাজার হোক্‌, মেয়ে তো? কিন্তু উপায় কি? মুক্তি যে তাকে পেতেই হবে…ছলে, বলে, অথবা কৌশলে রুমাদেবীকে মুক্ত করতে হবে। যুক্তকরে মহাদেবী শক্তির শক্তি প্রার্থনা ক'রে কৃষ্ণা পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলে…

এখন চাই সে-ঘরের চাবি। চাবি নিশ্চয় সুমিয়ার কাছেই আছে। অন্য কোথাও রাখবার মেয়ে নয় সে। শয্যায় সুমিয়ার মাথার শিয়রে, সম্ভব একটা টুলের ওপর অন্ধকারের বন্ধু একটা অতি মৃদু আলো যেন এইমাত্র-মরা কোনো নির্য্যাতিত বন্দীর নিষ্প্রভ চোখের মত সকরুণ দৃষ্টিতে নিদ্রিতা-প্রহরীণীকে পাহারা দিচ্ছে।

সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোয় কৃষ্ণা দেখলে, ঘুমন্ত সুমিয়ার

গায়ে-আঁটা নিমার পাশ থেকে ওর বুকের ওপর বেরিয়ে আছে একটা রঙিন্ রুমালের কিছু অংশ। পাশে প'ড়ে আছে একখানা বার্ম্মিজ হাত-পাখা। এক-হাতে সেই পাখা নিয়ে সুমিয়ার মুখের ওপর ভাসা-ভাসা বাতাসের দোল দিতে-দিতে, আর-এক সাবধানি-হাতে ধীরে—ধীরে—ধীরে—ধীরে—আ-আ-আঃ! এতক্ষণের বন্ধ নিশ্বাসটা বেরিয়ে এসে যেন স্বস্তির বার্ত্তা পেঁাছে দিয়ে গেল কৃষ্ণার কাছে।

রুমালের এককোণে পাক-দিয়ে বাঁধা বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা চাবি। এরি জন্যে এত!

চাবিটা হস্তগত ক'রে আবার পা টিপে-টিপে বেরিয়েই সে দরজার শেকলটা তুলে দিলে। ক'দিন বাইরে বেড়িয়ে কৃষ্ণা জেনেছে, এ গুহার দিকে কেউই থাকেনা, যে ক'জন পুরুষ আছে এখানে, তারা বিপরীত-দিকের একটা গুহায় থাকে। সুমিয়ার ঘুম ভাঙবার পর সে চীৎকার করলেও এই বদ্ধ-গুহার মধ্যে সে-স্বর তাদের কানে পৌঁছোবে না।

আগামী-কাল আ-চিন্ আসবে। মিংলোর মুখে শুনেছে কৃষ্ণা, আ-চিন্ এসেই তাদের এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। পুলিস এ-জায়গার সন্ধান করছে, হয়তো যে-কোনোদিন সদলবলে এসে ঘিরে ফেলবে। আ-চিন্ এবার বর্ম্মায় ফিরবে···তার অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে সে নিশ্চিন্ত হবে।

অপহৃত সম্পত্তি···বর্ম্মা···
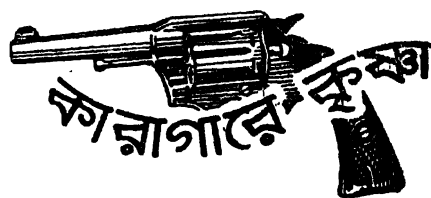
কথাটা কৃষ্ণার মনে লাগে। রতনের কাহিনী মনে পড়ে—মালয়ের ব্যবসায়ী আওচি লিং, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুং। সুমিয়ার কথা-প্রসঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে দু-একটা আভাসও যেন সে পেয়েছিল।

আজকের প্রহরী—মিংলো।

কৃষ্ণা জানে, দিনে একজন আর রাত্রে একজন প্রহরী এখানে পাহারা দেয়। মিংলোর কাছে সে জেনেছে, আজ রাত্রে সে পাহারায় থাকবে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার বেশী দেরী নেই, আজ হয়তো দ্বাদশী-ত্রয়োদশী হতে পারে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা—মিংলো এই পথেই ঘুরবে।

—"কে? কে দাঁড়িয়ে?"

অকস্মাৎ চম্‌কে উঠে কৃষ্ণা দেখলে, পাশে দাঁড়িয়ে মিংলো… গুলীভরা বন্দুকটা সে উঁচু ক'রে ধরেছে। একটা হাত তোলে কৃষ্ণা—"আমি। মিংলো, আমি কৃষ্ণা।"

—"তুমি? তুমি একা এই রাত্রে এখানে!"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যায় মিংলো···আস্তে-আস্তে সে উদ্যত বন্দুকটা নামিয়ে নেয়।

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে, মিংলোর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, আমি এসেচি মিংলো। নিশ্চয়ই তাতে তুমি অ-খুশী হওনি?"

—"অ-খুশী!" অসভ্য মিংলোর চোখ দুটি উজ্বল হয়ে ওঠে, মুখখানা খুশীর হাসিতে ভ'রে যায়।···আ-আ! কি পেলব স্পর্শ!

—"কিন্তু, তুমি একা এই কালা-রাতে···তুমি কি সুন্দর! ···কি সুন্দর!!···"

তার হাতখানা নিজের কোমল দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কৃষ্ণা গদগদ-কণ্ঠে বলে ঃ

—"আমাকে পাহারা দিতে তোমার খুব ভালো লাগে—না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে যাতে চিরকাল একসঙ্গে থাকতে পাও, সেই চেষ্টা করোনা; আমাকে মুক্ত ক'রে বাইরে···দূরে···খুব দূরে তোমার দেশে নিয়ে চলো না! একটু আগে আমি কি ক'রে এসেচি জানো? সুমিয়াকে ঘরে শেকল দিয়ে এসেচি তার ঘুমন্ত-অবস্থায়। এখন জাগলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না সে। পালাতে যদি হয় তো এই ঠিক সময়। চলো যাই, তোমার দেশে ···তোমার ঘরে···"

—"আমার দেশে···আমার ঘরে!!"
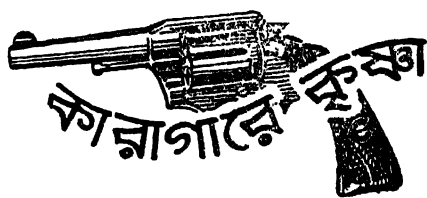
তার হাতের উপর মৃদু একটা চাপ দেয় কৃষ্ণা...

—"হ্যাঁ-হ্যাঁ লক্ষ্মীছেলে, তোমার দেশে...তোমার ঘরে... আমরা দুটিতে...তুমি আর আমি..."

কদম্ব-কেশরের মত মিংলোর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা জেগে ওঠে... আনন্দে মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরোয় না।

কৃষ্ণা বললে, "হ্যাঁ, আমি তোমার ঘরেই যাবো মিংলো। কাল সকালে আ-চিন্ আসছে, সে এলেই তো আবার আরম্ভ হবে আমার নির্য্যাতন ; সেইজন্যেই আমি এখন পালাতে চাচ্চি। সেই কুৎসিত কদাকার লোকটার যত শক্তিই থাক্, আমি কখনই তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারবো না, তাই তোমার সাহায্য চাচ্চি। আমি জানি—যদি কেউ আমায় মুক্তি দিয়ে, আশ্রয় দিতে পারে, সে একমাত্র তুমি—মিংলো।"

মিংলো আত্মহারা হয়ে পড়ে...চোখের খোলা-পাতা নেমে আসে...সঙ্গে-সঙ্গে বেহেস্তও নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে... ওর হাতের কাছে। নিঃশব্দে মিংলো কৃষ্ণার হাতের ওপর হাত বুলোয়—তারপর বলে, "হ্যাঁ, তোমায় রক্ষা করবো, তোমায়

আমি নিয়ে যাবো কৃষ্ণা। আ-চিন্‌কে আমিও কোনোদিন ভালোবাসতে পারিনি; তার সর্ব্বনাশ হোক্ এ-কামনা আমিও অনেকদিন থেকে করি। চলো—আমরা দু'জনে আজ এখনই চলে যাবো, আ-চিন্ কাল ফিরে আসবার আগেই আমরা পালাবো।"

সে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছিল।

কৃষ্ণা বুঝেছে, ওষুধ ধরেছে। এ-সময় মিংলোকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে···

বন্দুকটা পিঠে বেঁধে নিয়ে মিংলো বললে, "তাহ'লে এসো, আর দেরী কোরো না।"

দু'পা এগিয়ে গিয়েই কৃষ্ণা হঠাৎ থম্‌কে থামে।

মিংলো বলে, "কি হলো, থামলে যে?"

কৃষ্ণা তার হাতখানা ধ'রে আর্দ্র কণ্ঠে বললে, "আমার মাসীমাকে যে নিয়ে যেতে হবে, মিংলো! ওঁর জন্যেই আ-চিন্ আমায় আটক করেছে···ওঁকে না নিয়ে যেতে পারলে তো আমি শান্তি পাবো না! লক্ষীটি মিংলো, ওঁকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে।"

মিংলো দাঁড়ালো, চিন্তিত-মুখে বললে, "কিন্তু, চাবি তো আমার কাছে নেই···দরজায় যে তালা দেওয়া আছে।"

কৃষ্ণা হাতের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "চাবি আমি এনেচি, নিয়ে চলো।"
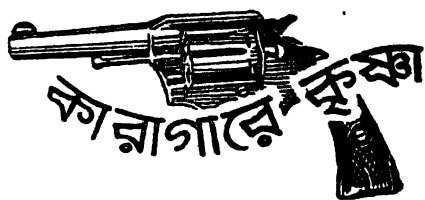
অবাক-বিস্ময়ে মিংলো চাবিটা দেখে নিলে, তারপর বললে, "তোমার যাওয়া চলবে না, সেখানে পাহারা আছে, তোমায় দেখলেই চিনবে—গোলমাল করবে। তুমি এখানে এই ঝোপের মধ্যে দাঁড়াও, এখানে বাঘ-ভালুক নেই, আ-চিনের দাপটে তারা পালিয়েছে, সেজন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। আমি পাহারা-ওয়ালাকে কোনো একটা অছিলায় কোথাও পাঠিয়ে, তোমার মাসীমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসছি।"

তার মধ্যে যে কোনো মন্দ মতলব নেই তা তার মুখ দেখেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বলে, "বেশ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, যত শিগগির পারো, তুমি আমার মাসীমাকে নিয়ে এসো।"

একটা ঝোপের আড়ালে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইলো, চাবি হাতে নিয়ে, শিস দিতে-দিতে মনের আনন্দে মিংলো এগিয়ে চললো—কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখা গেল না।

সন্দেহ হয়,—মিংলো বিশ্বাস রাখবে তো? হয়তো চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে সে এখানকার বর্ত্তমান নেতা—আচিনের ডান-

হাত, সাংগ্রোর হাতে দেবে···সব কথা তাকে হয়তো জানাবে··· হয়তো···

অনির্দ্দিষ্ট কতদূরে কোথায় সমতল স্থান, কতদূর হেঁটে গেলে সেখানে পৌঁছোনো যাবে তাই-বা কে জানে! হয়তো এতক্ষণ সুমিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে···ঘরের মধ্যে সে চীৎকার করছে! বাইরের লোক কোনোরকমে যদি জানতে পারে তাহ'লে তার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভাবতে কৃষ্ণা ঘেমে ওঠে।

মিনিট-পাঁচেক এইরকম অস্বস্তিতে কাটবার পরে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোতে দেখা যায় দূরে একজন লোককে, সে এইদিকেই আসছে···

মিংলো কি?

কাছে না-আসা পর্য্যন্ত কৃষ্ণা নড়ে না, আড়ষ্ট ভাবে ঝোপের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা ক্রমশঃ কাছে এলো···ঝোপের পাশ দিয়ে আবার চলেও গেল!

সর্ব্বনাশ! ও তো মিংলো নয়? তবে কি যে-প্রহরীকে কৌশলে সরিয়ে দেবার কথা ব'লে গেল মিংলো, সেই লোকটা? বরাতে কি আছে কে জানে!

এর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই দেখা গেল, মিংলো আসছে আর তার পেছনে আসছে একটি মেয়ে। সে যেন আর হাঁটতে পারছে না। তবে দূর থেকে আন্দাজ করা যায়, মিংলো
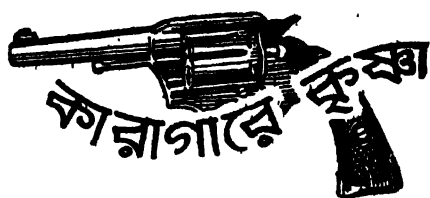
মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে জোর ক'রে তাড়াতাড়ি চলতে বলছে।

তারা স্পষ্ট হতেই ঝোপের আড়াল থেকে কৃষ্ণা বাইরে আসে—

এই রুমাদেবী! শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ···কৃশাঙ্গী একটি মেয়ে, কৃষ্ণার বয়সী বা তার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। কৃষ্ণাকে সামনে দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দু'হাত বাড়ায়···কৃষ্ণা সযত্নে তার হাত দু'খানা চেপে ধরে, "তুমি রুমামাসী···তুমি আমার···"

মিংলো ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলে, "তাড়াতাড়ি চলো কৃষ্ণা, পারিসানা এখুনি ফিরবে, আমি তাকে খেতে পাঠিয়েছি, ফিরে সে যখন দেখবে, বন্দিনী নেই—তখন সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। তাড়াতাড়ি ছুটে চলো, একটুও দেরী নয়।"

আগে-আগে মিংলো···তার পেছনে চলে কৃষ্ণা ও রুমা। যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে আরম্ভ করে ওরা। বেচারা রুমা যতবার পার্ব্বত্য-পথে পা পিছ্‌লে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে যায়, ততবার কৃষ্ণা ওকে হাত ধ'রে তুলে খুব সাবধানে নিয়ে চলে।

ষোলো

দীর্ঘ পথ যেন আর ফুরোতে চায় না—শীর্ণা রুমা আর চলতে পারে না···অবসন্ন ভাবে শুয়ে পড়ে···ওঠবারও ক্ষমতা থাকে না আর।

মিংলো ভয় পেয়ে বললে, "পারিসানা যদি ফিরে এসে বন্দীর ঘরের দরজা খোলে, তাহলেই সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ হয়তো চারিদিকে তাদের লোক ছুটেছে, বান্দরী-খালে আ-চিনের কাছেও খবর গেছে। বান্দরী-খাল এখান থেকে বেশী দূর নয়, আ-চিন্ সকালের মধ্যে এসে পৌঁছোবে, যদি কোনোরকমে ধরা পড়ি তাহ'লে হয়তো তোমাদের কিছুই হবেনা, কিন্তু আমায়—আমায় তারা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে মারবে···জীবন্ত আমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে···"

বলতে-বলতে সে শিউরে ওঠে!

কৃষ্ণা সে-কথা বিশ্বাস করে। আ-চিন্ যে-প্রকৃতির লোক, জীবন্ত-মানুষের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা এখন কোন্‌দিকে চলেছি, মিংলো?"

মিংলো উত্তর দিলে, "আমরা লামডিংয়ের দিকে যাচ্ছি। লামডিং পৌঁছোতে পারলে তবু আশা আছে, ওখান থেকে ট্রেনে
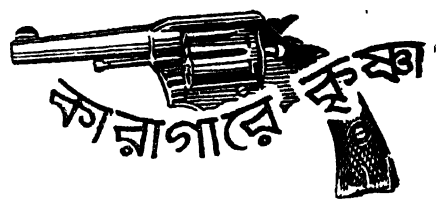
ক'রে আমি লখিমপুরে যেতে পারি। কিন্তু লামডিং এখনো অনেক দূর, এখান থেকে তিন-চার ক্রোশ হবে! এতখানি পথ যাওয়া তোমার মাসীমার পক্ষে অসম্ভব!

ভোরের আর বিলম্ব ছিল না…পূর্ব্ব-আকাশ আস্তে-আস্তে ফরসা হয়ে আসছে…

এতক্ষণে রুমা চোখ মেললে।

কৃষ্ণা তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, "এখন হাঁটতে পারবে, রুমা-মাসি? আর বেশী দূর নেই, লামডিংয়ের কাছে এসেচি, সকাল হতে-হতেই ওখানে পৌঁছোতে পারবো বল্‌চে মিংলো।"

রুমা ওঠবার চেষ্টা করে, কৃষ্ণা ওকে সাহায্য করে।

বেচারা রুমা। পা দু'খানা ওর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। দু-তিন মাস বন্দিনী-অবস্থায় আ-চিনের দলের লোকের সঙ্গে ওকে এখানে-ওখানে নানাস্থানে ঘুরতে হয়েছে।

তবু রুমা হাঁটে, অতি কষ্টে কৃষ্ণাকে অবলম্বন ক'রে চলে।

মিংলোকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু পরিশ্রান্ত কৃষ্ণার কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়না।

চলতে-চলতে হঠাৎ মিংলো থেমে গেল···ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললে, লুকোও—লুকোও কৃষ্ণা, আ-চিনের গলার স্বর শুনতে পেয়েছি, নিশ্চয় এই পথেই ফিরছে তারা।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা পাথরের আড়ালে সে কৃষ্ণা ও রুমাকে টেনে নিয়ে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'সে পড়ে! সরু পার্ব্বত্য-পথে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, কথা বলতে-বলতে তারা এগিয়ে চলেছে···

ও তো আ-চিনেরই কণ্ঠস্বর···আ-চিন্ ধমক দিচ্ছে—"আঃ, কি আস্তে-আস্তে হাঁটচো তোমরা? পেছনে পুলিস আসছে, খেয়াল নেই? এখুনি ধরা পড়তে হবে···তারপর শাস্তির কথাটা ভাবো··· ছুটে এসো···এখুনি আড্ডা ভেঙে দিতে হবে···ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিস আসবে···কোনো ভুল নেই···

খুব দ্রুত তারা ছুটে চলে।

ভগবান রক্ষা করেছেন, নইলে যদি ধীর-ভাবে যেতো তারা— নিশ্চয়ই দেখতে পেতো কৃষ্ণাদের। পুলিস পেছনে আসছে··· ধরা পড়বার সম্ভাবনায় আ-চিন্ ছুটে চলেছে···এদিক-ওদিক চাইবার অবকাশ নেই ওর···এও কি সম্ভব? কে বলে, ভগবান ঘুমিয়ে আছেন কলিকালে? এইতো সবে কলির সন্ধ্যে··· এরি মধ্যে? কৃষ্ণা শিক্ষিতা মেয়ে তাই রক্ষে, নইলে স্বৈরাচারী
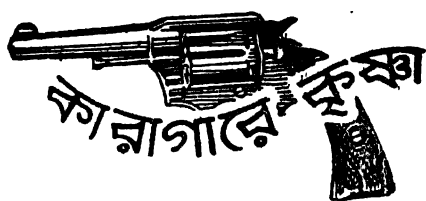
দস্যুর ত্রস্ত-শঙ্কিত ভাব দেখে, প্রতিশোধ-নেওয়ার সাফল্যে 'হা-হা-হা-হা' অট্টহাস্য ক'রে এইরকম সময়েই তো নির্য্যাতিত-বন্দীরা আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার ক'রে ওঠে!

পদশব্দ দ্রুত মিলিয়ে যায়...কথাবার্ত্তাও তাদের শোনা যায় না আর...তবু পনেরো-কুড়ি মিনিট কৃষ্ণা, রুমা আর মিংলো সেখানে অপেক্ষা করে...স'রে যেতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা বললে, "ওঠো, এবার এগিয়ে চলা যাক্। পুলিস আসচে,—আমাদের আর কোনো ভয় নেই মিংলো।"

আনন্দে কৃষ্ণার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রুমাও অনেকখানি উৎসাহ পায়, শুধু বিমর্ষ হয়ে পড়ে—মিংলো।

দুর্ব্বল-পায়ে চলতে-চলতে সে যা বলতে থাকে তার বাংলা করলে মানে এই হয় যে, 'রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে, আমার কাছে দু-ই সমান। আ-চিন্ জীবন্ত-অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াবে...পুলিস নাহয় ফাঁসি দেবে...নয়তো দেবে দ্বীপ চালান্...তফাৎ শুধু এই।'

সে আর হাঁটতে পারে না।

কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দেয়—"না—না—না, ভুল করচো মিংলো,—পুলিস তোমায় রাজসাক্ষী ক'রে নেবে, তোমায় কোনো শাস্তিই পেতে হবে না।"

মিংলো মনে-মনে হাসে, কৃষ্ণার সাহস দেওয়ার রকম দেখে। কিন্তু চোখ তার ক্রমেই ভিজে ওঠে···

একটা বাঁক ঘুরতেই সশস্ত্র পুলিস-দলের সামনে এসে পড়ে এরা তিনজন···

তারা যুগপৎ বন্দুক উঁচু করে···সঙ্গে-সঙ্গে কার চীৎকার কানে আসে—"কে, কৃষ্ণা? আমাদের কৃষ্ণা?···"

পরমুহূর্ত্তে ছুটে আসেন সুজন মিত্র, তাঁর পেছনে প্রণবেশ—

—"মামা?"

কৃষ্ণা ছুটে যায় প্রণবেশের কাছে, আত্মহারা প্রণবেশ তার মুখখানা দু'হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে ক্ষুদ্র বালকের মত উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ওঠেন।

বেচারা প্রণবেশ। এ-ক'দিন যে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তা তাঁর আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। সত্যি, প্রণবেশ আর আগেকার সেই সৌম্যমূর্ত্তি প্রণবেশ নেই, আধখানা হয়ে গেছেন যেন।

কৃষ্ণা তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, "চুপ করো মামা, যখন ফিরে এসেচি তখন আর কারও ক্ষমতা নেই যে, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবে।"
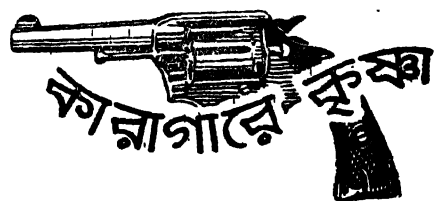
প্রণবেশ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "কিন্তু এ-ক'দিনে তোর কি চেহারা হয়েছে কৃষ্ণা…দেখে চেনা যায় না…কেন তুই এমন জায়গায় এলি ?"

কৃষ্ণা হাসে, বলে, "তোমার চেহারাটাই বুঝি আগের মত আছে ? রোগা আধখানা হয়ে গেছ যে একেবারে ! হ্যাঁ, সুজনমামা, আগে আপনাকে একটা কথা জানাই—একটু আগে আ-চিন্ এই পথে গেছে। ঝোপের আড়ালে ঐ মস্ত-বড় পাথরটার পেছনে আত্মগোপন ক'রে থাকার সময় শুনেচি, আমাদের নিয়ে সে আজই বর্ম্মায় চলে যাবে বলতে-বলতে যাচ্চে। যাক্, আর তাকে ভয় করবার কারণ নেই, যখন আপনারা এসে পৌঁচেছেন। …এই দেখুন, কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি…ইনিই আমার রুমা-মাসী ! বহু কষ্টে এঁকে উদ্ধার ক'রে আনতে পেরেছি শুধু এই মিংলোর সাহায্যে !" ব'লে মিংলোকে কৃষ্ণা দেখিয়ে দিলে।

মিষ্টি হাসিতে মিংলোকে তুষ্ট ক'রে, তারপর রুমাকে অভিবাদন জানিয়ে সুজন বললেন, "দু'জন কনেস্টবল সঙ্গে দিচ্ছি,

কৃষ্ণা; এঁদের নিয়ে তুমি লামডিংয়ে ফিরে যাও। প্রণবেশ! আমি আ-চিনের ব্যবস্থা ক'রে যত শীগগির পারি ফিরে আসছি।"

পুলিস-দল নিয়ে সুজন মিত্র দ্রুত সাম্‌নের দিকে ছুটলেন।

সতেরো

লামডিং পৌঁছেই গৌহাটী ফেরবার ট্রেন পাওয়া গেল।

একখানা ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়লেন প্রণবেশ রুমা ও কৃষ্ণা...কনেষ্টবল দু'জনও উঠে বসলো।

—"মিংলো...মিংলো কোথায় গেল ?"

কৃষ্ণা এদিক-ওদিক তাকায়...মিংলো কখন কোন্ ফাঁকে স'রে পড়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশভাবে কৃষ্ণা ব'সে পড়ে, বলে—"বেচারার কপালে অনেক লাঞ্ছনা আছে দেখছি। রামের হাতে মরলে তবু স্বর্গ পেতো...রাবণের হাতে মরে ওকে অনন্ত নরকেই যেতে হবে মনে হচ্চে।"

রাগ ক'রে প্রণবেশ বললেন, "যাক্ না নরকে! চিরকাল ডাকাতি ক'রে এসেছে, জানে, পুলিসের হাতে পড়লে দুর্গতির একশেষ হবে—শাস্তি পেতে হবে। তার চেয়ে পালালো, বেঁচে গেল। যাক্, রুমাকে পাওয়া গেছে এই আমাদের সৌভাগ্য।"

—"ভবতোষবাবুকেও পাওয়া গেছে, ল্যাংটিংয়ে ওঁদের সেই বাড়ীতে।"

—"বাবা···বাবাকে পাওয়া গেছে?"

রুমা আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে।—"কেমন আছেন তিনি···খুব রোগা হয়ে গেছেন বোধহয় ভেবে-ভেবে···তা হোক্, বেশ ভালো আছেন তো?"

বিষণ্ণ-কণ্ঠে প্রণবেশ বললেন, "তাঁর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। একে বৃদ্ধ—তার ওপর বহুদিন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলেন, এখন তিনি অত্যন্ত পীড়িত। তাঁকে গৌহাটীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি তোমার পথ-পানে চেয়ে আছেন রুমা···"

এ-কথা শুনে রুমা যেন পাথর হয়ে যায়, নিঃশব্দে তার চোখের কোণ দিয়ে কেবল জল ঝ'রে পড়ে···

ট্রেন গৌহাটীতে পৌঁছোলো। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে তাতে রুমা ও কৃষ্ণাকে উঠিয়ে, প্রণবেশ নিজেও উঠলেন।

অত্যন্ত অসুস্থ ভবতোষ চৌধুরী—বাঁচবার আশা নেই, সহরের বড়-বড় ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়েছেন।

রুমা গিয়ে পিতার পাশে বসলো, কৃষ্ণা খানিক সেখানে

থেকে, রতনের নির্দ্দেশমত পাশের ঘরে গেল বিশ্রাম করতে

তারপর স্নানাদি সেরে চা পান করতে-করতে কৃষ্ণা বললে, "অনেক কথাই শুনেচি মামা...ভবতোষ চৌধুরী লোকটি বড় সুবিধের নয়, অনেক কীর্ত্তিই করেচেন তিনি।"

উৎসুক প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি-রকম ?"

কৃষ্ণা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তা বলতে সুরু করে ঃ

'ভবতোষ চৌধুরী একদিন রতনকে সঙ্গী ক'রে চলে যান মালয়ে—তারপর সেখানে তিনি আউচি লিং নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি পেয়েছিলেন। আউচি লিং অত্যন্ত সহৃদয় লোক ছিলেন, ভবতোষ চৌধুরীকে তিনি খুব বিশ্বাসও করেছিলেন।

আউচি লিং ছিলেন বিপত্নীক, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুংকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন শিক্ষার জন্যে।

ভবতোষ চৌধুরীই আউচি লিংকে জানান্ যে, মাও তুং এক আমেরিকান-মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, খৃষ্টধর্ম্ম নিয়েছে। এরপর আউচি লিং হঠাৎ একদিন মারা যান ...মাও তুং তারপর ফিরে আসে...কিন্তু তার অনেক আগে ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার রবার-বাগান, কারখানা সব বিক্রি ক'রে প্রচুর টাকা সংগ্রহ ক'রে ল্যাংটিংয়ে চলে আসেন। মাও তুং কোনরকমে জানতে পারে যে, তার পিতাকে ভবতোষ চৌধুরী

হত্যা করেছেন এবং জাল উইলে প্রতিপন্ন করেছেন, এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক তিনিই। সেই দলিলের মধ্যে দেখা গেল যে, বিধর্ম্মী পুত্রকে তিনি এক পয়সাও দেন্‌নি। তাঁর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভবতোষ চৌধুরীকেই তিনি স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

কপর্দ্দকহীন মাও তুং আত্ম-নাম ও পরিচয় গোপন ক'রে 'আ-চিন্' নাম নিয়ে কৃষ্ণাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ম্মায় ফেরবার পর বসন্ত হওয়ায় তার বাঁচবার আশা ছিল না, এবং তাতেই তার একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর মুখে অজস্র ক্ষত চিহ্ন হওয়ায় ফলে মুখখানা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়।

সুমিয়ার পরিচয়ও কৃষ্ণা সংগ্রহ করেছে, মিংলোর কাছে··· আ-চিনের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী সুমিয়া।

বসন্ত হয়ে যখন আ-চিন্ মরণাপন্ন, তখন এই মালয়ী-মেয়েটি প্রাণপণ যত্নে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, যার ফলে আ-চিন্ জীবন ফিরে পেয়ে, কৃতজ্ঞতায় গ'লে গিয়ে সুমিয়াকে বিবাহ করেছিল।

উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্নী সুমিয়া। স্বামীকে সে ভালোবাসতো···নির্ব্বিচারে তার ভালো-মন্দ সব কাজই প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করতো। আ-চিনের অবর্ত্তমানে সেই তার সমস্ত কাজ চালিয়েছে···দল পরিচালনা করবার শক্তি তার যথেষ্ট ছিল।

এরপর মাও তুং, প্রবঞ্চক ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান করতে থাকে। কপর্দ্দকশূন্য মাও তুং অবশেষে দস্যুদল গঠন ক'রে নিজে তাদের অধিনায়ক হয়। বর্ম্মায় সে যে-দলে ছিল, সে-দল ধরা পড়ার পর ছদ্মবেশে সেইসময় ভারতের সমস্ত দেশ তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়িয়েছে ভবতোষ চৌধুরীকে। ল্যাংটিংয়ের হাতীখালিতে তার অবস্থানের খবর পেয়ে, দেখা করতে গিয়ে দেখা হয়নি···গোহাটীতে গিয়ে অপমানিত মাও তুং ফিরে যায়।

প্রতিহিংসা সে নিয়েছে। ভবতোষ চৌধুরীর ম্যানেজার রামশরণ সিংকেই শুধু সে হস্তগত করেনি, তার দাসদাসী, কর্ম্মচারীদের সকলকেই সে হাত করেছিল। রামশরণ সিং তার আদেশে সব-কিছু ঘৃণ্য কাজ করতো এবং এদের সাহায্য নিয়েই একদিন রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীকে অচৈতন্য অবস্থায় গৌহাটীর বাড়ী থেকে তাঁকে হাতীখালির বাড়ীতে এনে, বাড়ীর যে-ঘরটি পরিত্যক্ত-অবস্থায় প'ড়ে থাকতো, সেই ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছিল।'

প্রণবেশের কাছে শোনা গেল, কৃষ্ণা অন্তর্হিত হওয়ার পর

সুজন ফিরে এসে, পুলিস নিয়ে সেই বাড়ী অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু রামশরণ সিংকে সেখানে পাওয়া যায়নি। দু'দিন আগে সে নাকি নিজের দেশে যাত্রা করেছে, সম্ভব এতদিনে গ্রেপ্তারও হয়েছে। বাড়ী সার্চ্চ করবার সময় চাবি-বন্ধ কুঠুরীটার মধ্যে জীবন্মৃত-অবস্থায় শুধু ভবতোষ চৌধুরীকে পাওয়া গেছে।

আ-চিন্ জাল দলিলপত্র সব নিয়ে গিয়ে রেঙ্গুণ-কোর্টে দাখিল করেছে, শীগগিরই ভবতোষ চৌধুরীকে, মাও তুংএর সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে।

দস্যু-দলপতি হিসেবে আ-চিন্ ওরফে মাও তুংকে পুলিস এখন ধরবার চেষ্টায় ফিরছে। সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে ভোগ করার পরিবর্ত্তে তাকে হয়তো এখন আজীবন-কালের জন্মে জেলের দুর্ভোগই ভোগ করতে হবে।

রুমাকে মাও তুং তার পিতার কথা জানিয়েছিল। রুমা পুলিসে খবর দিয়ে মাওতুংকে ধরাবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই বন্দিনী হয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছে। নইলে বেচারা

রুমার ওপর মাও তুংয়ের কোনো রাগ ছিল না, রুমা নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে। উত্তেজিত প্রণবেশ তারপর বললেন, "যাক্, সব কাজই তো মিটে গেল...এবার কলকাতায় চলো...এখানে আর একটা দিন নয়...আমার মোটে ভালো লাগছে না...এখন কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি... এতে তুমি অমত্ত কোরো না কৃষ্ণা...সত্যি আমার অবস্থাটা একবার বোঝো।"...এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলবার পর নিশ্বাস নিতে প্রণবেশ থামলেন, তারপর অধীর-আগ্রহে কৃষ্ণার মতামত জানবার জন্যে তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন।

কৃষ্ণা মাথা কাত ক'রে বললে, "তুমি ব্যাকুল হয়োনা মামা, আর দু'দিন অপেক্ষা করো, ওঁর অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় দেখি। যদি তেমন কিছু হয়, রুমা-মাসীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে...ওঁকে তো আর এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না!"

প্রণবেশ মুখ ভারী করেন। রুমা মেয়েটির উপর তাঁর এতটুকু স্নেহ নেই,—তাকে এড়াতে পারলে বাঁচেন তিনি।

আঠারো

জনকয়েক লোককে বন্দী ক'রে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন সুজন। মাও তুংকে ধরতে পারা যায়নি—সে কোন্ পথ দিয়ে স'রে গেল, অশেষ নির্য্যাতন করেও দলের কোনো লোকের মুখ থেকে সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বার করতে পারা যায়নি।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে—"সুমিয়া কোথায় গেল, মাও তুংয়ের স্ত্রী?"

সুজন উত্তর দেন—"ও, সেই কালোমত মেয়েটি তো? সে আত্মহত্যা করেছে।"

—"আত্মহত্যা!...কেন?"

কৃষ্ণা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

সুজন বললেন, "কারণ, সে মাও তুংয়ের সঙ্গে পালাতে পারেনি। সে-সময় খুবই অসুস্থ ছিল সে, নড়বার ক্ষমতা ছিলনা তার। শুনলুম, অনেক মিনতি ক'রে শেষে জোর ক'রে সে মাও তুংকে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন পৌছোলুম ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে বিষপান করেছে। অনেক চেষ্টা করেছি...তাকে যদি বাঁচাতে পারি তবে মাও তুংকে কোনোদিন পাবার আশা থাকবে...কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে সে চলে গেছে।"

সুমিয়ার জন্যে কৃষ্ণা প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে... দুঃখিত হয়। নিজে সে জীবন দিয়েছে...তার স্বামীকে সে বাঁচিয়েছে...উপযুক্ত স্ত্রীর কাজ করেছে সে। সে আর

যাই হোক্, সত্যিকারের সহধর্ম্মিণী বটে। তার আত্মার সদ্গতির জন্যে কৃষ্ণা মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

ভবতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কথা তাঁর বন্ধ হলেও ভেতরে জ্ঞান ছিল, হতজ্ঞান-প্রায় রুমাকে কৃষ্ণার হাতে তুলে দিয়ে, কপর্দ্দকহীন ভবতোষ চৌধুরী সেদিন রাত্রে মহাপ্রস্থান করলেন।

বাধ্য হয়ে কৃষ্ণাকে আরও কয়েকটা দিন থাকতে হলো।

গৌহাটীতেই রুমা পিতার শেষকাজ সম্পন্ন করলে। বাড়ীতে রতনকে পাহারায় রেখে একদিন রাত্রে চোখ মুছতে-মুছতে রুমা —কৃষ্ণা ও প্রণবেশের সঙ্গে কলকাতা-গামী ট্রেনে উঠে বসলো।

বাংলায় এই তার প্রথম যাত্রা।

হয়তো চিরকালের মতই গৌহাটী ত্যাগ ক'রে যাওয়া··· রুমা সজল-চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে···শান্তভাবে ধীরে-ধীরে মাথাটা নত ক'রে আবাল্যের লীলাভূমি গৌহাটীকে একটা প্রণাম জানায়···

ট্রেন তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

শেষ

অতঃপর প্রকাশিত হবে

নব-পর্য্যায়ে 'কৃষ্ণা-সিরিজ'এর দ্বিতীয় গ্রন্থ ঃ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত

মায়াবী কৃষ্ণা

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা একবাক্যে প্রশংসা করেছেন ঃ

মাঝে-মাঝে পুলিশের সাহায্য নিতে হলেও কৃষ্ণার বাহাদুরী আছে। ভদ্রঘরের চরিত্রবতী এই মেয়েটি নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির জোরে প্রয়োজনবোধে ছদ্মবেশে, অভিনেত্রীর মন নিয়ে যে অসাধ্য-সাধন করেছে···স্বৈরাচারী দুর্ব্বৃত্ত নরপশুদের কবল থেকে নিজের নারীধর্ম্ম বজায় রেখে, ছলে-বলে-কৌশলে আত্মরক্ষার ও নির্য্যাতিতা মেয়েদের উদ্ধারের জন্য যে-সব নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছে, তা শুধু তার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উপযুক্ত পিতার লালনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য একথা সত্য যে,

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। সংসারে এমন মানুষ আছে, যে তো কোনো অপকার করেনি, অথচ তাকে দেখলেই তোমার আপাদ-ম জ্বলে যাবে। আবার কাউকে দেখা মাত্র লজ্জিত বিনয়ে বিগলিত

হয়ে, বিনা কারণেই তার আদেশ পালন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে—কৃষ্ণা হচ্ছে সেই শেষের শ্রেণীর মানুষ।

রক্তবীজ-ধ্বংসকারিণী মহিষমর্দ্দিনী আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা প্রত্যেক নারীই যে মহাশক্তির অধিকারিণী—তা তাঁদের বোঝাতে হবে, মাতৃজাতির লাঞ্ছিতকারী দস্যু দলন ক'রে।

আপনাদের ঘরের মেয়ে 'কৃষ্ণা' তা কাজে পরিণত করবার ইঙ্গিত দেবে তার ধারাবাহিক জীবনেতিহাসের পাতায়-পাতায়!

তার এবারের ঘটনার পথ আরও কণ্টকাকীর্ণ···গতি উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল···কিন্তু লক্ষ্যস্থান, দেবভোগ্য সুন্দর প্রেম-নিকেতন!

দ্বিতীয় গ্রন্থ বাংলার যে-কোনো দোকান থেকে সংগ্রহ ক'রে প'ড়ে দেখুন।